শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্‌যাম রহ.

ফিলিস্তিনের স্মৃতি

অনুবাদ

আবদুস সাত্তার আইনী

অনুবাদকের কথা

শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্‌যাম রহ.-এর বক্তৃতাসংকলন 'যিকরাইয়াতু ফিলিস্তিন'-এর অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে মাসিক রহমতে প্রকাশিত হয়েছিলো। এবার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। এ-বইয়ে ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনি, আরব নেতাদের ধারাবাহিক বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইসরাইলের সঙ্গে তাঁদের আঁতাত, ইসলামের আন্দোলনের বিকাশ ও সঙ্কোচন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ-বইয়ে এমনকিছু ঘটনা ও তথ্যের বর্ণনা আমরা পাই যে-সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিলো বা এ-ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আমাদের মনে হয় নি। বর্তমানে যে-ফিলিস্তিন-সঙ্কট চলছে এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে কিছু মানুষের যে-সংগ্রাম অব্যাহত আছে তা বোঝার জন্য এ-ঘটনাগুলো জানা জরুরি।

আমাদের মনে হয়, ফিলিস্তিনের মুক্তিসংগ্রামের এক মহান সৈনিকের আত্মস্মৃতি বাংলাভাষায় এটাই প্রথম। কারণ, এ-ধরনের বই কখনো আমাদের গোচরীভূত হয় নি। ফিলিস্তিন-বিষয়ে আবদুল্লাহ আয্‌যামের আরও রচনা আছে; আমরা আশা করি, অচিরকালের মধ্যেই সে-রচনাগুলোর অনুবাদ পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পারবো।

আমি আরবি থেকে হুবহু বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যেখানে বক্তব্য ছিলো একেবারেই সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য, সেখানে আমি কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছি। বয়ানে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে এবং যেখানে প্রয়োজন মনে করেছি টীকা সংযোজন করেছি। আশা করি, এতে পাঠক উপকৃত হবেন।

আবদুস সাত্তার আইনী
২০ আগস্ট, ২০১৪
abdussattaraini@gmail.com

পবিত্র ভূমির সন্তানদের সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় কি এখনো
হয় নি? এখনো কি সময় হয় নি জান বাজি রেখে লড়াই করার?
আমি যেসব ভীতি ও আতঙ্ক অনুভব করি সেগুলো আছে অপসৃত হওয়ার
অপেক্ষায়... যদি তার কৌশল পরিবর্তন করা হয় এবং শত্রুর মোকাবেলায়
মৃত্যুপ্রস্তুতির ঘোষণা দেয়া হয়; কিন্তু :
যখন কামড়ে ধরার জন্যে উদ্ধত দাঁত ছাড়া আর কিছুই থাকে না
তখন সেগুলো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কী করার থাকে?
সুতরাং যারা শুরু করেছে তাদের কল্যাণ হোক...

উ । ৎ । স । র্গ

ফিলিস্তিনের শাহাদাতবরণকারী
ভাই-বোনদের উদ্দেশে

শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্‌যাম রহ.

ফিলিস্তিনের স্মৃতি

অনুবাদ
আবদুস সাত্তার আইনী

প্রকাশক
বদরুদ্দীন আহমাদ তকি
মাকতাবাতুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.

প্রচ্ছদ ॥ হা মীম কেফায়েত

সার্বিক যোগাযোগ
মাকতাবাতুল ইসলাম
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন : ০১৯১১৬২০৪৪৭ ০১৯১২৩৯৫৩৫১
E-mail : imaktabatulislam@gmail.com

মূল্য : ১৪০ [একশত চল্লিশ] টাকা মাত্র

FILISTINER SMRITI
Writer : Dr. Abdullah Azzam Rh.
Translated by : Abdus Sattar Aini
Published by : Maktabatul Islam.
Price : Tk. 140.00 US $ 8.00 only.

ISBN : 978-984-90977-2-3
www.facebook/Maktabatul Islam

সূচি

কিছু কথা

অনেক মুসলমান ভাই আছেন, যাঁরা শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম সম্পর্কে ভালো জানেন না। যাঁরা তাঁর লেখাগুলো পড়েন নি বা তিনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে ধারণা রাখেন না তাঁরা হয়তো অবচেতনভাবে মনে করবেন তিনি আফগানিস্তান নিয়েই মগ্ন ছিলেন; ফিলিস্তিনের কথা ভুলে ছিলেন এবং ফিলিস্তিনের জন্যে কোনো কাজ করেন নি। এমনকি ফিলিস্তিনের অনেক মুসলমান ভাই এ-ধরনের কথা বলেন এবং বেশ স্পষ্টভাবেই বলেন।

হায়, এই বন্ধুরা যদি সামান্য কষ্ট করতেন, তাঁর বইগুলো পড়তেন, তাঁর বক্তৃতার রেকর্ড শুনতেন, তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন তাঁর দেহটাই শুধু আফগানিস্তানে ছিলো আর তাঁর হৃদয় ও আত্মা ছিলো মসজিদুল আকসা [জেরুজালেম] ও নাবলুস পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে বিগলিত।

বরং আমরা বলতে পারি—বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি, শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম ফিলিস্তিনের জন্যে যা করেছেন, যাঁরা ফিলিস্তিন নিয়ে বেশি গান গান, বক্তৃতার মঞ্চে, সভায় ও সমাবেশে কথার তুবড়ি ছোটান এবং চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করেন তাঁরা সেটা করেন নি।

কেনো নয়! তিনি শত শত ফিলিস্তিনি যুবককে সৈনিক ও আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধারূপে প্রস্তুত করেছেন। কেনো নয়! বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি নাবলুস, খলিল ও জেরুজালেমের পর্বতমালার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি আবদুল্লাহ আয্যামের লেখায় ও ভাষণে—যদি পড়ে থাকেন—তার প্রমাণ পাবেন। এবং সন্দেহ নেই, আপনি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌছুবেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

এ-গ্রন্থটি শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যামের ফিলিস্তিন সম্পর্কিত ভাষণের ক্ষুদ্র সংকলন; তাঁর বক্তৃতার রেকর্ড থেকে সংকলিত হয়েছে। আমৃত্যু তিনি ফিলিস্তিন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন, মূল্যবান ভাষণ দিয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। তার অধিকাংশ ইতোপূর্বে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শুধু ফিলিস্তিন বিষয়ে এককভাবে কোনো পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশিত হয় নি। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ড. আবদুল্লাহ আয্যামের ফিলিস্তিন সম্পর্কিত অধিকাংশ লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও আমরা সেসব লেখা সংকলন করতে বিলম্ব করে ফেলেছি। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ফিলিস্তিন সম্পর্কিত যে-সব রচনা কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নি বা যেসব লেখা ও ভাষণ আমাদের হাতে অবশিষ্ট ছিলো বা পরবর্তী সময়ে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, সেসব লেখা একত্র করে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করবো। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে ফিলিস্তিন সম্পর্কিত যাবতীয় রচনা একত্র করে একটি বা দুটি খণ্ডে প্রকাশ করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

নিবেদক
ড. আবদুল্লাহ আয্যাম প্রচার কেন্দ্র।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু কথা

যেসব বিষয়ের আলোচনা এ-গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে তার প্রতিটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি, প্রতিটি মুসলিম যুবক বিশেষ করে ফিলিস্তিনের যুবকেরা এতে উদ্বেলিত হবেন। পাঠক চিন্তার খোরাক পাবেন এবং তাঁর বর্তমান কর্মপন্থা কী হবে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা পাবেন। এ-গ্রন্থের প্রতিটি লেখা ইমানী চেতনা জাগ্রত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখবে। ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম—এ বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকা উচিত। মুসলিম হওয়ার পরও কেউ যদি অন্য ধর্মকে সত্য মনে করে এবং নিজ ধর্মের অবমাননা সহ্য করে তাহলে তার বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ থেকে যাবে। নিম্নে এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলো:

- ফিলিস্তিনের নিপীড়িত-নিগৃহীত মুসলমান সম্পর্কে ড. আবদুল্লাহ আয্যামের বক্তব্য;
- ফিলিস্তিনে তাঁর অবস্থান এবং জিহাদে অংশগ্রহণ ও ফিলিস্তিন সীমান্ত প্রহরার স্মৃতি;
- শিক্ষা ও অভিজ্ঞতামূলক কাহিনি ও বর্ণনা—চেতনাদৃঢ় মুসলিম জাতির জন্যে বার্তা;
- কীভাবে বিশ্বের আরব ও অনারব গোষ্ঠী ফিলিস্তিন জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে এবং ফিলিস্তিন বিক্রি করে দেয়ার পাঁয়তারা করছে;
- যেসব ফিলিস্তিনি যুবক জেরুজালেম ও মসজিদুল আকসাকে নিজেদের অধিকারে ফিরিয়ে আনতে চায় তাদের জন্যে কিছু নির্দেশনা এবং সেটা কীভাবে সম্ভব তার কিছু কৌশল;

আমরা আবারো পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ড. আবদুল্লাহ আয্যামের ফিলিস্তিন সম্পর্কিত যেসব রচনা পূর্বপ্রকাশিত কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, এ-গ্রন্থ সেসব রচনারই সংকলন।

নিবেদক
ড. আবদুল্লাহ আয্যাম গবেষণা সংস্থা।

শহীদ ইমাম আবদুল্লাহ আয্যামের আলোকিত কথামালা

- আমাদের মনে প্রথম যে-কথাটির উদয় হয় তা হলো, আমরা আফগানিস্তানের হিন্দুকুশের চূড়ায় পৌঁছেছি—এখন কীভাবে আমরা ফিলিস্তিনেও এই অবস্থায় পৌঁছতে পারি।
- আমি একজন ফিলিস্তিনি। যদি ফিলিস্তিনে যাওয়ার কোনো সুযোগ আমার হয় এবং মসজিদুল আকসায় পাহারা দেয়ার সুযোগ আমার হয়, তাহলে সেখানে আমি লড়াই করতেই পছন্দ করবো।
- জেনে রাখা উচিত, মসজিদুল আকসার ভালোবাসা আমাদের বিশ্বাসের অংশ; তা আমাদের আকিদার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং আমাদের দীনের একটি স্তম্ভ। এই চেতনা আমাদের রক্তে সর্বদা বহমান এবং আমাদের আত্মায় চিরকাল বিরাজমান।
- জেনে রাখা উচিত, আমরা আল্লাহর পথে বের হয়েছি এবং সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছি কখন আমরা মসজিদুল আকসার চূড়ায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পতাকা উড্ডীন করতে পারবো। কখন প্রিয়নবীর মেরাজের সূচনাস্থল আল-আকসায় কালিমার পতাকা উড়াতে সক্ষম হবো।
- আমাদের প্রধান সংকল্প হলো আফগানিস্তানকে শত্রুমুক্ত করা এবং তার সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনা। এ-কাজটি আমাদের দীনের অংশ এবং অত্যাবশ্যক দায়িত্ব। বাইতুল মাকদিস স্বাধীন করা এবং আল-আকসাকে তাওহিদের ছায়া ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কালিমাতলে নিয়ে আসাও আমাদের জন্যে আবশ্যক কর্তব্য।
- যাঁরা মনে করেন আফগানিস্তানে জিহাদ অব্যাহত রাখার অর্থ হলো ফিলিস্তিনে ইসলামি বিপ্লব দমিত রাখা তাঁরা আসলে ভুল বুঝছেন এবং সত্য থেকে দূরে রয়েছেন। আসলে নেতৃত্ব কীভাবে ফিরিয়ে আনতে হয় এবং অধিকারে রাখতে হয় সে-ব্যাপারে তাঁদের অজ্ঞতা রয়েছে। কীভাবে আন্দোলন ও দ্রোহ-চেতনা জাগ্রত করতে হয় এবং কীভাবে ইসলামি বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিতে হয় তা তাঁরা জানেন না। বিশাল আকারে ইসলামি সেনাদল তৈরি করে কীভাবে পৃথিবীকে নৈরাজ্য-কলহ থেকে পবিত্র রাখা যায় সে বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা কম।

- রক্তরঞ্জিত কাবুলের ঘটনাবলি আর ফিলিস্তিনের রক্তাক্ত বদ্ধভূমির কাহিনির সূত্র একই। হিন্দুকুশের ওপর নিহত মুসলমান ও রক্তস্রোত এবং গাজায় নিহত মুসলমান ও রক্তস্রোতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হেলমান্দ, বাল্খ ও হেরাতে এতিমদের আর্তচিৎকার ও বিধবাদের বুকফাটা বিলাপ এবং নাবলুস, উম্মুন নুর, খলিল ও কুদসে বিধবাদের বুকফাটা বিলাপ ও এতিমদের আর্তনাদের উৎস একই এবং সমান দুঃখদায়ক। আফগানিস্তানের বিপর্যয় ও দুর্দশা এবং ফিলিস্তিনের বিপর্যয় ও দুর্দশা সমান ভয়াবহ।
- এসব কাহিনি বস্তুত একই কাহিনি—রক্তাক্ত ইসলামের কাহিনি। পৃথিবীর চারদিক থেকে এখন শত্রুরা চূড়ান্ত বর্বরতা ও হিংস্রতা নিয়ে ইসলামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শত্রুর আগ্রাসন কবলিত দীনের কাহিনি আসলে অজস্র হিংস্রতার শিকার মুসলিম জাতির কাহিনি। যখন জিহাদ থেমে যাবে, ইসলামের শত্রুদের আত্মা থেকে ভয় দূর হয়ে যাবে এবং তাদের সাহস বেড়ে যাবে [তখন তারা অবশ্যই মুসলিম উম্মাহর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।] মুসলিম জাতি তখন ব্যর্থ-অথর্ব হয়ে বসে থাকবে, তখন তাদের সমগ্রতা অর্থহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। যখন অস্ত্র ঝনঝনিয়ে উঠবে, তরবারি কোষমুক্ত থাকবে তখনই কেবল শেয়ালেরা তাদের গর্তে আশ্রয় নেবে।
- আমরা এখন ইহুদি ও তাদের দোসরদের এবং আমেরিকা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের প্রতি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে পারি যে ফিলিস্তিনে পরিপূর্ণ জিহাদ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা স্থির হবো না, ক্ষান্ত হবো না।
- বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে যদি আমাদেরকে সামান্য সময়ের জন্যে ফিলিস্তিনের জিহাদ থেকে বিরত রাখা হয় এবং এই উম্মাহর মসজিদুল আকসার ভূমিতে লড়াইয়ের ইবাদত থেকে বাধা দেয়া হয়—এর অর্থ এই নয় যে ফিলিস্তিন সম্পর্কে আমাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।
- মসজিদুল আকসাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের মতাদর্শের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমাদের মৌলিক সংকল্প।
- মসজিদুল আকসাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের কর্মপরিকল্পনার প্রধান অংশ। আমরা কাবুলে নিজেদের প্রস্তুত রেখেছি এবং শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপক অস্থিরতা ও মসজিদুল আকসা মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা একমুহূর্তের জন্যে আমাদের স্বস্তি দিচ্ছে

না। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি ও বিষাদগ্রস্ত মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প আমাদের নির্ঘুম রাখে।

- ইহুদিরা যখনই কোনো যুদ্ধের পরিকল্পনা করবে তখনই সেটা নস্যাৎ করে দিতে হবে।
- সন্তানহারা মায়ের দুঃখ এবং স্বামীহারা নারীর দুঃখ অন্যকেউ বুঝবে না। আমি ফিলিস্তিনের সন্তান এবং আমার পরিবার-পরিজন ফিলিস্তিনেই রয়েছে। আমি আমার মাতৃভূমি হারিয়েছি। আমার দেশ এখন শত্রুর কব্জায়। আমি দেশহারা, মাতৃভূমিহারা। দুঃখ, আফসোস ও যাতনায় আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে... ফিলিস্তিনের জন্যে... আমার প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে।
- ফিলিস্তিন অবশ্যই আফগানিস্তান থেকে উত্তম স্থান। যখন আমাদের হাতে শিকল পরানো হলো এবং সকল সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হলো এবং আমরা কাপড় টেনে-চলা অন্তঃপুরের মেয়েদের মতো হয়ে গেলাম—কবি যেমন বলেছেন, গায়িকাদের দেহ থেকে ঝুলছে আঁচল, তেমন—এবং নারী ও শিশুদের মতো বসে রইলাম, তখন আমরা সে-জীবন ত্যাগ করে আফগানিস্তানের দুঃখ-দুর্দশার ভূমিতে চলে এসেছি। কারণ—শুধু দুঃখীই দুঃখীর দুঃখ বোঝে।

প্রকাশনা ও পরিকল্পনা বিভাগ
আবদুল্লাহ আয্যাম প্রচার কেন্দ্র।

বাইতুল মাক্‌দিস থেকে কাবুল

আমার ভাইয়েরা, গত মজলিসে আমরা ফিলিস্তিনের জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বস্তুত আরবের যে-দেশটিতে নির্বিচারে হত্যা ও নিপীড়ন চালানো হয়েছে এবং হচ্ছে সেটা হলো ফিলিস্তিন। কোনো আরব মুসলমান বা পৃথিবীর অন্য কোনো মুসলমান এ-ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পাবেন না। কারণ ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে মুসলমানেরা যথাযথ ভূমিকা পালন করেন নি বা করছেন না। কোনো মুসলমানের হাঁচির জবাব দেয়া ফরযে কেফায়া অথবা সুন্নতে কেফায়া। কেউ হাঁচি দিয়ে দোয়া পড়লে উপস্থিত কাউকে না কাউকে তার জবাব দিতে হবে। অন্যথায় সবাইকে গুনাহগার হতে হবে। সহিহুল বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারি এবং সহিহু মুসলিম-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ শারহুন নাবাবিতে এ-ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। কারো আগ্রহ জাগলে দেখে নেবেন।

হাঁচির উত্তর দেয়ার বিধান সম্পর্কিত ব্যাখ্যা যেমন রয়েছে তেমনি এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের কী হক তারও ব্যাখ্যা রয়েছে। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যদি মুসলিম জাতি আক্রান্ত হয় এবং পীড়নের শিকার হয়, তাহলে তাদের উদ্ধার ও সহযোগিতায় গোটা মুসলিম জাতির এগিয়ে আসা ফরয। যদি কোনো দেশের মুসলমানেরা এগিয়ে আসে এবং আক্রান্তদের উদ্ধারের জন্যে প্রচেষ্টা ব্যয় করে তাহলে হয়তো পাপ থেকে বাঁচা যাবে। অন্যথায় সব মুসলমানই গুনাহগার হবে।

দুঃখের কথা, ফিলিস্তিনিদের প্রতি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রই সর্বাত্মকভাবে এগিয়ে আসে নি এবং যথাযথ ভূমিকা পালন করে নি। মুসলিম বিশ্ব যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করতো তাহলে ১৯৬৭ সালের বিপর্যয় এড়ানো যেতো। ১৯৬৭ সালের বিপর্যয় এতোটাই ভয়াবহ ছিলো—আমি মনে করি না আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের জীবনে এ-ধরনের বিপর্যয় কখনো ঘটেছিলো।

১৯৬৭ সালের ৫ই জুন ইসরাইল পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। মাত্র তিন ঘণ্টার হামলায় সে জর্ডান, মিসর, ইরাক ও সিরিয়ার আকাশ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। মাত্র তিন ঘণ্টায় ছোটো একটি রাষ্ট্রের হাতে তিনটি দেশের পরাজয় ঘটে। ইসরাইল—যার আয়তন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর বিশ ভাগের একভাগও নয়, যার জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীর পনেরো ভাগের একভাগও নয় এবং যার সৈন্যসংখ্যা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যসংখ্যার অর্ধেকও নয়—সেই ইসরাইলের হাতে

তিনটি রাষ্ট্রের পরাজয় ঘটে। আরবদের কপালে এই কলঙ্কতিলক কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

হামলার তিনদিনের মাথায় ইসরাইলি স্থলবাহিনী সুয়েজ এলাকা দখল করে নেয়। একই গতিতে তারা মিসর ফ্রন্টে গাজা ও সিনাই উপত্যকা, জর্ডান ফ্রন্টে পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিমতীর এবং সিরিয়া ফ্রন্টে গোলান মালভূমি দখল করে নেয়।

হস্তান্তর ছাড়া গোলান মালভূমির পতনের কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। গোলান মালভূমিতে বিশাল বিশাল পাহাড়ের সমাবেশ এবং সেখানে রয়েছে বিশাল বিশাল গর্ত। বিমান থেকে ছয়মাস বোমা বর্ষণ করেও তার একটি পাহাড় ধসানো যেতো না। আমি মনে করি, এই রাষ্ট্রগুলো দখল করতে পাঁচশো ইহুদিও নিহত হয় নি। অথচ [আফগানিস্তানের] কেবল জাজি[1] ফ্রন্টে—সেই রমজানে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম—শত শত রুশ সেনা নিহত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের তিনটি ফ্রন্ট মিলিয়েও সে-পরিমাণ ইহুদি সেনা নিহত হয় নি। ইসরাইল যা করেছে ঠিকই করেছে। তাদের তো কেউ প্রতিরোধ করে নি!

মিসরীয় সেনাবাহিনী সংবাদ সম্মেলন করে জোর গলায় ঘোষণা দিয়েছিলো, আমরা ইসরাইল ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তারা এমন ভাব দেখিয়েছিলো যে, হে সমুদ্রের মৎসকুল, তোমরা ক্ষুধার্ত হও; আমরা ইহুদিদের ধরে তোমাদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করবো। তারা ভেবেছিলো তেলআবিব তাদের দখলে চলে আসবে এবং মিসরের গায়িকা উম্মে কুলসুম[2] সেখানে গান গাইবে। তারা এগিয়ে গেলো এবং সিনাই উপত্যকায়

---

[1] পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী একটি এলাকা। এখানে ১৯৮৭ সালের ২০ শে মে থেকে ১৩ই জুন পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এ-যুদ্ধে মুজাহিদদের পক্ষে নেতা ও কমান্ডার ছিলেন জালালুদ্দিন হক্কানি, মুহাম্মদ আনোয়ার ও আবদুল্লাহ আয্যাম এবং সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে নেতা ও কমান্ডার ছিলেন বরিস গ্রোমভ, গর্বাচেভ, নাজিবুল্লাহ ও মুহাম্মদ রফি। এখানে বহু রুশ সেনা হতাহত হয়। এই যুদ্ধ জাজির যুদ্ধ নামে পরিচিত।

[2] উম্মে কুলসুমঃ বিখ্যাত আরব গায়িকা; 'প্রাচ্যের নক্ষত্র' অভিধায় পরিচিত। তাঁর আসল নাম ফাতেমা ইবরাহিম। মিসরের সমুদ্রতীরবর্তী জেলা দাকহালিয়্যা-এর তামাই আয-যাহায়ারা অঞ্চলে তিনি ১৯১০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফ্য করেন। চমৎকার কণ্ঠের অধিকারী হওয়ার কারণে সংগীতে অল্প বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেন। সমকালীন বিখ্যাত কবি আহমদ শাওকি, হাফিয ইবরাহিম, আযিয আবাযা, আহমদ রামি প্রমুখের লেখা গানে সুরারোপ করেন। অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আরব কবি ও পাকিস্তানের জাতীয় কবি মুহাম্মদ ইকবালের লেখা গানেও সুর দেন তিনি। গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি কয়েকটি ফিল্মে অভিনয়ও করেন। বিপুল বিত্তের অধিকারী উম্মে কুলসুম সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন এবং মিসরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে দান করতেন।

একমাসব্যাপী অবস্থান করলো। ওখানে তারা ভোজ ও সংগীতে মেতে থাকে। তারা জপতে থাকে... উম্মে কুলসুম এই যুদ্ধে তোমার সঙ্গে আছে... আবদুল হালিম এই যুদ্ধে তোমার সঙ্গে আছে... আরো নানা কিছু। আফসোস, আমরা একবারও তাদের বলতে শুনি নি এই যুদ্ধে আল্লাহপাক তোমার সঙ্গে আছেন। প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের[৩] নিকট রিপোর্ট পেশ করা হলোঃ সোমবারের[৪] আক্রমণ কারো কোনো ক্ষতি হয় নি; কেউ হতাহত হয় নি। কোনো ভূমি হাতাছাড়া হয় নি, কেউ পালিয়ে যায় নি, কোনো কিছুর পরিবর্তন ঘটে নি।

মিসরীয় সৈন্যরা এমনি এমনি অবস্থান করেছে। তারা মরুভূমিতে বাঙ্কার বা

---

[৩] জামাল আবদুন নাসের ১৫ই জানুয়ারি ১৯১৮ সালে আলেকজান্দ্রিয়ার আসইয়োত জেলার বনি মুর (বাকোস) এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুন নাসের ও ফাহিমা দম্পত্তির প্রথম সন্তান তিনি। জামাল আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে পড়াশোনা করেন। তিনি স্কুল ও কলেজে ভালো ছাত্র ছিলেন না। উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র ৪৫ দিন উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ইজিপ্সিয়ান সোশ্যালিস্ট পার্টির মাধ্যমে রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে রয়্যাল মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তির আবেদন করে ব্যর্থ হওয়ার পর আইন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আইন কলেজে অকৃতকার্য হওয়ার পর পুলিশ একাডেমিতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। সেক্রেটারি অব স্টেট ইবরাহিম খাইরি পাশার সহায়তায় সামরিক কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৮ সালে সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট্ পদে কমিশন লাভ করেন। সামরিক কলেজে আনোয়ার সাদাত ও আবদুল হাকিম আমের তাঁর সতীর্থ ছিলেন। ১৯৪৩ সালে কায়রোর রয়্যাল মিলিটারি একাডেমিতে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে স্বাধীন কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ২৩ শে জুলাই জেনারেল মুহাম্মদ নাজিবের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাজা প্রথম ফারুককে উৎখাত করেন। ১৯৫৩ সালে ১৮ই জুন মুহাম্মদ নাজিব প্রেসিডেন্ট এবং জামাল ডেপুটি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জামাল ১৮ই জুন ১৯৫৩ থেকে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ এবং ৪ঠা মার্চ ১৯৫৪ থেকে ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪ পর্যন্ত ডেপুটি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ১৪ই নভেম্বর তিনি রেভুল্যশনারি কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২৩ শে জুন ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭০ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকেন। একই সঙ্গে তিনি ১৯৫৪ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ই মার্চ ১৯৫৪, ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৪ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬২, ১৯ শে জুন ১৯৬৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ৫ই অক্টোবর ১৯৬৪ থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ পর্যন্ত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর মহাসচিব ছিলেন। 'প্রথম ফিলিস্তিন যুদ্ধের স্মৃতি', 'মিসরের স্বাধীনতা : বিপ্লবের দর্শন', 'মুক্তির পথে' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জামাল আবদুন নাসের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের কাছে অপ্রিয় ছিলেন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের হাজার হাজার কর্মীকে কারারুদ্ধ করেছিলেন, তাদের ভয়াবহ নির্যাতন করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি সাইয়্যিদ কুতুবকে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে হত্যা করেন।

[৪] ১৯৬৭ সালে যেদিন ইসরাইল একই সঙ্গে সিরিয়া, মিসর ও জর্ডানে আক্রমণ করেছিলো।

প্রতিরক্ষাদুর্গ নির্মাণ করে নি; যদিও সৈনিকদের জন্যে আবশ্যক হলো বাঙ্কার বা প্রতিরক্ষাদুর্গ নির্মাণ করা। তারা যে-বাঙ্কার নির্মাণ করে নি তার কারণ আছে। একজন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?' প্রেসিডেন্ট বললেন, আপনি কি মনে করেন আমরা যুদ্ধ করবো? আপনি যা দেখছেন তার সবকিছু হলো রাজনৈতিক প্রদর্শনী। গোলান মালভূমি থেকে ট্যাঙ্কগুলোকে ফিরে আসতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

চার্চিল[৫] বলেন, 'যখন সিরিয়ার গোলন্দাজ বাহিনী ইসরাইলে দখলকৃত এলাকায় স্তূপীকৃত আবর্জনা ও শুকনো ঘাসের ওপর হাজার হাজার টন গোলা ফেলছিলো তখন ইসরাইল তাদের ট্যাঙ্কবহরের বেষ্টনীতে বুলডোজার দিয়ে গোলান মালভূমির দিকে পথ তৈরি করছিলো।' তিনি আরো বলেন, 'মিসরীয় ট্যাঙ্কগুলোর প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের একটি ট্যাঙ্কের চেইন বিকল হয়ে পড়ে। সেই ট্যাঙ্ক-চালক তার ট্যাঙ্কের গোলামুখ মালভূমিতে নিয়োজিত ইসরাইলের ট্যাঙ্কবহরের দিকে তাক করে এবং হামলা করে বসে। সে তাদের ছয়টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে এবং আট ঘণ্টার জন্যে ইসরাইলের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। বিধ্বস্ত ট্যাঙ্কগুলো অন্যান্য ট্যাঙ্ক চালনার জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।' সেই মুহূর্তে ইসরাইল এই সামান্য বাধার মুখে পড়ে।

জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী সা'দ জুমআ[৬]—যিনি সেই ভয়াবহ বিপর্যয়কালে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—বলেন, 'আমরা এবং সিরিয়া একমত হয়েছি, আকাশপ্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে আমরা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখবো।' ইনিই জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী, ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি তাঁর কৃতপাপাচারের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে আল্লাহর দরবারে তওবা করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে

---

[৫] এখানে (تشرشل) চার্চিল বলে Randolph Churchill বা Winston Churchill-কে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা দুজন যৌথভাবে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের ওপর *The Six Day War* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৯৬৭ সালে Houghton Mifflin Company থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এই উইনস্টন চার্চিল ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও লেখক স্যার উইনস্টন চার্চিল নন। কারণ তিনি ১৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] সা'দ মুহাম্মদ জুমআ ১৯১৬ সালে দক্ষিণ জর্ডানের তাফিলা এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি কুর্দি। দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালের ২৩ শে এপ্রিল থেকে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এর আগে তিনি আম্মানের মেয়র (১৯৫৪-১৯৫৮), উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৮-১৯৫৯), ইরান ও সিরিয়ায় রাষ্ট্রদূত (১৯৫৯-১৯৬২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত (১৯৬২-১৯৬৫), চিফ অব রয়্যাল হাশেমিয়া কোর্ট (১৯৬৫) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এ-বছরই তিনি লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন। সা'দ জুমআর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : مجتمع الكراهية বা ঘৃণার সমাজ।

যাঁরা ছিলেন, যাঁরা প্রতিটি যুদ্ধফ্রন্টে বিশ্বাসঘাতকের কর্মকাণ্ড করেছিলেন, তাদের সবার অপদস্থতার কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। সা'দ জুমআ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন الله أو الدمار [আল্লাহর পথ অথবা ধ্বংস], أبناء الأفاعي [সর্প-সন্তান], المؤامرة ومعركة المصير [ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই] ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ; এসব গ্রন্থ লিখে তিনি মর্মযাতনা ও যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে সান্ত্বনা লাভ করার চেষ্টা করেছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি সুস্থ থাকেন নি। ধমনিতে রক্ত জমাট বাঁধার ফলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি যা দেখেছিলেন সবই সত্য বর্ণনা করেছিলেন। তিনি যা দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন জনসম্মুখে তা প্রকাশ করে দিয়ে কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন।

সা'দ জুমআ বলেন, 'সিরিয়ার সঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছি যে আকাশপ্রতিরক্ষাব্যবস্থা অটুট রাখা আমাদের আবশ্যক কর্তব্য। এ-ব্যাপারে আমি সকাল এগারোটার দিকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করি।'

সা'দ জুমআ বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। জিজ্ঞেস করি, "পরিস্থিতি কী?" প্রথমে আবদুন নাসের বলেন, "আমরা শত্রুদের তিনটি বিমান ভূপাতিত করতে পেরেছি। আমাদের বিমান তেলআবিবের আকাশে রয়েছে। মহারাজ আপনার কৌশল সুদৃঢ় হোক।"'

এই তারবার্তার লিখিত কপিতে "সালমা" নামের স্বাক্ষর ছিলো। এমনকি সঙ্কেতলিপিতেও আবদুন নাসেরের নাম "সালমা" ছিলো; সালমান নয়।

দুঃখ ও আফসোস হলো, এই তারবার্তা ইসরাইলের হস্তগত হয়। আমি সেই লড়াইয়ের সময় পশ্চিমতীরে ছিলাম। ইসরাইলি রেডিও স্টেশন সেই তারবার্তা ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচার করছিলো: 'আমরা শত্রুদের তিনটি বিমান ভূপাতিত করতে পেরেছি। আমাদের বিমান তেলআবিবের আকাশে রয়েছে। মহারাজ আপনার কৌশল সুদৃঢ় হোক। স্বাক্ষর— সালমা।' সবকিছু ছিলো রহস্যময় ও হতাশাব্যঞ্জক।

সেই দিন সকাল এগারোটার সময়ই মিসরের বিমান চলাচলব্যবস্থা পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং তাদের কোনো বিমান ইসরাইলি সীমান্তে পৌছতে পারে নি। ঠিক সেসময়ে জর্ডান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে এই আশ্বাসে যে মিসরীয় বাহিনীর বিমান তেলআবিবের আকাশে রয়েছে।

সা'দ জুমআ বলেন, 'আমরা সিরিয়ার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা বলেন, আমাদেরকে এক ঘণ্টা সময় দিন। আমরা বারোটার সময় আবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁরা বলেন, আমাদেরকে এক ঘণ্টা

সময় দিন। কিন্তু তার এক ঘণ্টা পরও তাঁদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব আসে না।' তিনি বলেন 'এখনো আমরা তাদের জবাবের অপেক্ষায় আছি।'

১৯৬৭ সালে মসজিদুল আকসার পতন ঘটে এবং ইহুদিরা তাতে প্রবেশ করে। আমি তখন সেখানে ছিলাম। অর্থাৎ, ইহুদিরা যখন মসজিদুল আকসা দখল করে নেয় তখন আমি পশ্চিমতীরে অবস্থান করছি। তারা মসজিদে প্রবেশ করে এবং চিৎকার শুরু করে দেয়। তারা চিৎকার করছিলো এবং আমি শুনছিলাম : 'মুহাম্মদ মারা গেছে; মুহাম্মদ মারা গেছে এবং কিছু অবলা তার উত্তরাধিকারী. হয়েছে।' মোশে দায়ান (Moshe Dayan)[৭] জেরুজালেম থেকে ইয়াসরিব পর্যন্ত এই ঘোষণা দেন।

আমরা মিসরীয় সেনাবাহিনীর আলোচনায় ফিরে আসি। ইসরাইলি ট্যাঙ্কবহর এগিয়ে আসে এবং সুয়েজ খাল দখল করে নেয়। মিসরীয় সৈন্যদল মরুভূমিতে অবস্থান করতে থাকে। তাদের একটি বৃহৎ অংশ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা পড়ে। তাদের উদ্ধার-কাজের জন্যে রেডক্রসকে অনুমতি দেয়া হয়। যেসব সৈন্য কায়রোতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, ইহুদিরা তাদেরকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। তারা হাজার হাজার মিসরীয় সৈনিককে বন্দি করে এবং তেলআবিবে পাঠায়। তেলআবিবে বন্দি সৈনিকদের জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমরা এখন কোথায়?' স্বাভাবিক কারণেই তাদের চোখ বাঁধা ছিলো। তারা জবাব দেয়, 'আমরা জানি না আমরা এখন কোথায়।' ইহুদিরা বলে, 'তোমরা এখন তেলআবিবে আছো। উম্মে কুলসুম তেলআবিবে তোমাদের গান গেয়ে শোনাবে।' হায়, উম্মে কুলসুম তেলআবিবে গান গেয়েছিলো!

এই লজ্জাজনক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ শেষ হয়, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেখানে আত্মোৎসর্গকারী মুজাহিদদের একটি সংগঠন ছিলো সেটি হলো ফাতাহ[৮]। সব আরব রাষ্ট্রের পতনের প্রেক্ষাপটে ফাতাহ ঘোষণা দিয়েছিলো

---

[৭] موشي دايان (জন্ম ১৯১৫, মৃত্যু ১৯৮১) : ইসরাইলি রাজনীতিবিদ ও সামরিক কর্মকর্তা। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরাইলি বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৭ সালে ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ইসরাইল ও আরবের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছেন না মনে করে ১৯৭৯ সালে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত কৃষিমন্ত্রী এবং ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ফিলিস্তি নদখল যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

[৮] ফাতাহ (فتح): পুরো নাম حركة التحرير الوطني الفلسطيني বা The Palestinian National Liberation Movement. এ-সংগঠনের নামকরণ করা হয়েছে সুরা 'আল-ফাতাহ'র নামের অনুকরণে। কারণ এ-সুরায় হুদায়বিয়ার সন্ধি করে মুসলমানরা ফাতাহ বা সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেছে বলে উল্লেখ আছে। ১৯৬৫ সালে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে

যে তারা ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। সুতরাং যারা এই লড়াইয়ে এগিয়ে আসতে চায় তারা যেনো এগিয়ে আসে। হে মুসলমানেরা, এগিয়ে আসো। হে আরব, তোমরা এগিয়ে আসো। যারা ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করতে চাও তারা এগিয়ে আসো। কিন্তু কিছু অল্পবয়সী তরুণ ছাড়া কেউ এগিয়ে আসে না। তারা তৃতীয় স্তরের সামরিক প্রশিক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এবং অধিকাংশই সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি (Conscription) থেকে পালিয়ে এসেছে। তারা এসেছিলো, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাস্তবতা ডালাপালা ছড়াতে থাকে এবং প্রয়োজনে বাস্তবতা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়।

হে মুসলমানেরা, তোমরা এগিয়ে আসো। মুসলমানেরা এগিয়ে আসে নি। হে জ্ঞানী সম্প্রদায়, তোমরা এগিয়ে আসো। জ্ঞানী সম্প্রদায় এগিয়ে আসে নি। ১৯৬৭ সালের একবছর পর থেকে মুসলমানেরা চেষ্টা শুরু করে। স্বভাবতই মুসলমানেরা ছিলো ঘুমিয়ে। মিসরে ইসলামি আন্দোলন ছিলো মৃত। এই লজ্জাজনক পরাজয়ের মাত্র নয় মাস আগে জাতি হারিয়েছিলো সাইয়িদ কুতুব রা.-কে। তিনি ছিলেন মিসরে ইসলামি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। আবদুন নাসের বৈপ্লবিক ইসলামি চিন্তাবিদ সাইয়িদ কুতব[৯] ও তাঁর দুই

ফাতাহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৪ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এটির প্রধান ছিলেন। সংগঠনটির গঠনতন্ত্রে ২৭ টি ধারা আছে। এটির মূলনীতি চারটি : ১. ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ; ২. সামাজিক গণতন্ত্র; ৩. সেক্যুলারিজম বা সাম্যবাদ; ৪. দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান। প্রাথমিক অবস্থায় সংগঠনটি ইসলামিক সংগঠন ছিলো। প্রধান কার্যালয় রামাল্লায় অবস্থিত। বর্তমান প্রধান মাহমুদ আব্বাস। ফাতাহর আছে ৬ থেকে ৮ হাজার যোদ্ধা এবং ৪৫ থেকে ৩০০ রাজনীতিক। ২০০৬ সালের ২৫ শে জানুয়ারির সংসদীয় নির্বাচনে ফাতাহ হামাসের কাছে পরাজিত হয়। ২০০৯ সালে ফাতাহর নতুন কর্মনীতি নির্ধারিত হয়। মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতিতে হামাসের সঙ্গে ফাতাহর বিরোধ রয়েছে।

[৯] পুরো নাম সাইয়িদ কুতুব ইবরাহিম হুসাইন আশ-শারিবি। মিসরের আসইয়োত জেলার মুশা গ্রামে ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা উসমান হুসাইন এবং মা ফাতেমা। কুতুব তাঁর বংশীয় অভিধা। গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কুরআন শরিফ হিফ্য করেন। ১৯২২ সালে কায়রোর মাদরাসাতুল মুআল্লিমিন আল-আওয়ালিয়্যা (আবদুল আযিয)-এ ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে এখানে তিন বছরের কোর্স সমাপ্ত করে ১৯২৫ সালে মাদরাসা-ই-তাজহিযিয়্যাতে ভর্তি হন। এখানে চার বছরের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯২৯ সালের শেষ দিকে দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের পাঠ সম্পন্ন করেন। একই বছরের ডিসেম্বর তাহজিরিয়া দাউদিয়্যাতে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত আরো তিনটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এ-বছরের ১লা মার্চ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে মন্ত্রণালয় তাঁকে আমেরিকায় প্রেরণ করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের ১৮ই অক্টোবর তিনি মন্ত্রণায়লয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। কিন্তু মন্ত্রী তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন নি। ১৯৫৪ সালের ১৩ই জানুয়ারি সাইয়িদ

সহযোদ্ধাকে ১৯৬৬ সালে ২৯ শে আগস্ট ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফাঁসিতে ঝুঁলিয়ে শহীদ করে। এই কলঙ্ক মিসরীয় জাতির কপালে চিরদিন লেপ্টে থাকবে।
আবদুন নাসের ইসলামি আন্দোলনের ১৭ হাজার কর্মীকে জেলখানায় বন্দি করে এবং তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। তার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামি আন্দোলকে চিরতরে শেষ করে দেয়া। ইসলামি আন্দোলনকারীদের জন্যে জামিন নিষিদ্ধ করা হয়। কারো যদি কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতো তাকে পুনরায় আটকাদেশ দেয়া হতো।
সিরিয়ায়ও ইসলামি আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সেখানে সমাজতন্ত্রীরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে এবং ছড়াচ্ছে—

آمنت بالبعث ربا لا شريك له   وبالعروبة دينا ما له ثاني

কুতুবের পদত্যাগপত্র করা গ্রহণ হয় এবং অভিযোগ করা হয় যে তিনি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালে সরকারবিরোধী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।
১৯৫০ সাল থেকেই সম্পৃক্ত থাকলেও সাইয়্যিদ কুতুব ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালের ১৩ই জুলাই পিপল্স্ কোর্ট সাইয়্যিদ কুতুবকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। ১৯৬৪ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। ১৯৬৫ সালের ৯ই আগস্ট তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২১ শে আগস্ট সাইয়্যিদ কুতুবসহ সাতজনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। ২৯ আগস্ট ভোর রাতে সাইয়্যিদ কুতুব ও তাঁর দুই সঙ্গীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়।
সাইয়্যিদ কুতুবের কর্মজীবনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড ও ইসলামি কর্মকাণ্ড। দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা দেয়া হলো। **কবিতা** : আশ-শাতিউল মাজহুল/অজ্ঞাত তট; কাফেলাতুর রাকিক/অভিযাত্রীদল; হিলমুল ফাজ্‌র/ভোরের স্বপ্ন; দিওয়ানু সাইয়্যিদ কুতুব/সাইয়্যিদ কতুবের কাব্য। **সাহিত্যসমালোচনা** : কুতুব ওয়া শাখসিয়্যাত/গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব; আন-নাকদুল আদাবি উসুলুহু ওয়া মানাহিজুহু/সাহিত্যসমালোচনা : নীতি ও পদ্ধতি। **ইসলামি শিক্ষা ও দর্শন:** আত-তাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন/ কুরআনের শিল্পশৈলী; মাশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন/ কুরআনে বর্ণিত কিয়ামত-দৃশ্য; আল-আদালাতুল ইজতিমাইয়্যাতু ফিল ইসলাম/ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার; মারিকাতুল ইসলাম ওয়ার রাসমিয়্যাহ/ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব; আস-সালামুল আলামি ওয়াল ইসলাম/ইসলাম ও বিশ্বশান্তি; আমেরিকা আল্লাতি রাআইতু/যে-আমেরিকা আমি দেখেছি; হাযাদ্ দীন/এই ধর্ম; মুস্‌তাক্‌বালু হাযাদ্ দীন/এই ধর্মের ভবিষ্যৎ; আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা/ইসলাম ও সভ্যতার সঙ্কট; নাহবা মুজতামায়িল ইসলামি/ইসলামি সমাজের অভিমুখে; তাফসির ফি যিলালিল কুরআন (৩০ খণ্ড); আল-জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ/আল্লাহর পথে জিহাদ। **অন্যান্য** : তিফলুন মিনাল কারইয়াহ/গ্রামীণ বালক (ছেলেবেলা); আল-আশওয়াক/আকাঙ্ক্ষা (ব্যক্তিজীবনের প্রেম); আল-মুদুনুল মাশহুরা/খ্যাতির নগরী (উপন্যাস); আল-আতইয়াফুল আরবাআ/চার ছায়ামূর্তি (চার ভাইবোনের চিন্তাধারা); আফরাহুর রুহ/আত্মার সুখ (চিঠির সংকলন); • আল-খারিফ/শরৎকাল (আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস)।

'আমরা আন্দোলনকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছি যার কোনো শরিক নেই এবং অভ্যুত্থানকে ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছি যার কোনো বিকল্প নেই।'[১০]

এবার জর্ডানের কথা বলি। সেখানে ইসলামি আন্দোলনের নেতারা নিজেদের বিশৃঙ্খলা ঘোচাতে এবং পরাজয়ের ক্ষতের কথা ভুলে যেতে চেষ্টা করলেন। জর্ডানে এবং ইসলামি বিশ্বে ও আরব রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি আন্দোলনের দায়িত্বশীলের সংখ্যা বেড়ে গেলো। তাঁরা আহ্বান জানালেন, হে মুসলমানেরা, তোমরা জেগে ওঠো। তোমরা ফিলিস্তিনের জন্যে জেগে ওঠো। কিন্তু মুসলমানেরা ছিলো গভীর ঘুমে মগ্ন এবং তাদের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো।

সুখের কথা, কিছু ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। এই ব্যক্তিরা ছিলেন ফাতাহর সাবেক ক্যাডার, নায়িফ হাওয়াতমা[১১] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক জোটের

---

[১০] হাফিজ আল-আসাদ সিরিয়ার রেডিও স্টেশন থেকে এই ঘোষণা দেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে হাফিজ আল-আসাদ ও তাঁর অনুসারীদের মতাদর্শ ও উদ্দেশ্য এক হলেও ব্যক্তি-পর্যায়ে তাদের বিরোধ ছিলো অনেক। এই হাফিজ আল-আসাদ আল্লাহপাককে জাদুঘরে স্থাপন করেন। (নাউযুবিল্লাহ) তিনি হুমাত শহরের জামেউস সুলতান মসজিদ এবং দামেস্কের উমায়ি মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন এবং এই দুটি মসজিদের সব মুসল্লিকে খুন করেছিরেন।

এই মতাদর্শের কবিরা সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে ইসলামের ওপর প্রধান্য দিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। তার আরো কিছু নমুনা : (سلام على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم) কুফ্‌রিকে জানাই সালাম, তা আমাদের ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তারপর জাহান্নামকে জানাই অভিনন্দন। (لا تسل عن ملتي أو مذهبي أنا بعثي اشتراكي عربي) আমার ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না; আমি বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী আরব।

[১১] نايف حواتمة : ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (DFLP)-এর মহাসচিব। ধর্মঃ ক্যাথলিক খ্রিস্টান। মার্ক্সবাদ দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৩৫ সালে জর্ডানের সালাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বয়রুত থেকে সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনে লেসান্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৪ সালে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। জর্ডানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর বাদশাহ হুসাইন তাঁর দণ্ড মওকুফ করেন। জর্জ হাবাশের সঙ্গে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন-এর নেতৃত্বে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে-দল ত্যাগ করে এসে গণতান্ত্রিক জোট প্রতিষ্ঠা করেন। নায়িফ হাওয়াতমা ১৯৭৩ সালে পশ্চিমতীর, গাজা এবং অন্যান্য অঞ্চল মিলিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তিনি ফিলিস্তিন-সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ইসরাইলের সঙ্গে আলোচনায় বসার কারণে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন (PLO)-এর রাজনীতির বিরোধিতা করেন এবং দামেস্কে এ-আলোচনার বিরোধিতাকারী আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলেন। ১৯৬৭ সালের পর ২০০৭ সালে প্রথম বারের মত তিনি PLO-এর বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে পশ্চিতীরে যাওয়ার অনুমতি পান।

সাবেক ক্যাডার বা জর্জ হাবাশ[১২] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফিলিস্তিন-মুক্তির জাতীয়তাবাদী জোটের সাবেক ক্যাডার। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করেছিলেন। আবদুন নাসের জর্জ হাবাশকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবেশী প্রত্যেক দেশই কিছু সামরিক লোকবল পাঠিয়েছিলো। কিন্তু এদের মধ্যে দীন-ধর্ম কিছু ছিলো না। সিরিয়া 'সিরিয়ান ডেথ প্লাটুন' ও ইরাক 'ইরাকি ডেথ প্লাটুন' প্রস্তুত করেছিলো; এরা সবাই নিজেদের মতাদর্শ বিস্তারের জন্যে ফিলিস্তিন-জর্ডান সীমান্ত এলাকায় সমবেত হয়েছিলো। মুসলমানেরা এই অঞ্চলে ইসলামের নাম ঘোষণাকারী কোনো দল বা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। তারা সে-এলাকা পর্যবেক্ষণ করে : কোন দলগুলো আল্লাহর দীনের কাছাকাছি, কোনটির কুফরি কম, কোন দলের অপরাধ কম বা কোন সংগঠন কম খারাপ ইত্যাদি। তারা ফাতাহকে খুঁজে পায়। অফিসাররা ফাহাতর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, আমরা আপনাদের নামের আওতায় কাজ করতে চাই। তবে শর্ত হলো, কাজের কৌশল আমরা নির্ধারণ করবো, অস্ত্রও থাকবে আমাদের; সবকিছু হবে আপনাদের থেকে পৃথক। তারা বলে, আমরা প্রশিক্ষণ-শিবিরের মতো শিবির স্থাপন করতে চাই। এই প্রশিক্ষণ-শিবির চারমাস পর্যন্ত ছিলো।

যাই হোক। মানুষের জন্যে আল্লাহপাকের নেয়ামত রয়েছে। তাঁর একটি বড়ো নিয়ামত হলো জিহাদের স্বাদ গ্রহণ করতে পারা। আমি মনে করতে পারি, যে-চারমাস আমি সেখানে ছিলাম সেই চারমাসের মধ্যে একবেলা

---

[১২] جورج حبش: আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (PFLP)-এর নেতা। ধর্মঃ অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তাঁর আরো দুটি নাম আল-হাকিম ও আবু মায়সা। মাক্সবাদ, লেনিনবাদ ও নাসেরিজম দ্বারা প্রভাবিত। ১৯২৬ সালের ২রা আগস্ট ফিলিস্তিনের আল-লুদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াফা ও কুদসে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৪ সালে বয়রুতের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা অনুষদে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে চূড়ান্ত ডিগ্রি অর্জন করেন। জর্জ হাবাশ মুসলমানদের সংগ্রামকেই ফিলিস্তিন-পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায় বিবেচনা করেন। তিনি আরব সংহতি ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আরব গেরিলা বাহিনী প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। ছাত্র সংগঠন আল-উরওয়াতুল উসকার অন্যতম প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (ANM) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে জর্ডানে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের অভিযোগে তাঁর দল অভিযুক্ত হয়। ফলে তিনি দামেস্কে চলে যান এবং ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ-সময় আবদুন নাসেরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯৬৭ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর পরাজয়ের পর তিনি পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন গঠন করেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর সংগঠন ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে। ২০০৮ সালের ২৬ শে জানুয়ারি আম্মানে মৃত্যবরণ করেন জর্জ হাবাশ।

ব্যতীত কোনোবারই তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পাই নি। পুরো চারমাস সকালে অর্ধেক রুটি, দুপুরে অর্ধেক রুটি এবং সন্ধ্যায় অর্ধেক রুটি।

হ্যাঁ, সত্যিই আমরা সে-দিনগুলোতে প্রচণ্ড ক্ষুধা সহ্য করেছি; কিন্তু সে-দিনগুলো ছিলো উপভোগ্য; বরং এই জীবনের সবচেয়ে উপভোগ্য দিন ছিলো সেগুলো। আমাদের প্রত্যেকের ভেতর এই অনুভূতি কাজ করতো যে পৃথিবীর সব মানুষের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে রয়েছে এবং আমরা সবার সেরা। প্রত্যেকে মনে করতো সে সব ব্যাপারে স্বাধীন; তার ওপর কর্তৃত্ব ফলাবার কেউ নেই। তাছাড়া আল্লাহপাকের সন্তুষ্টিপ্রাপ্তির অনুভূতি সবাইকে সুখ ও স্বস্তি দিতো। সেখানে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা এতো বেশি ছিলো যে তার দৃষ্টান্ত খুব বিরল। সে-এলাকায় আমরা ছাড়া আর কেউ ছিলো না। সেখানে মুসলমানদের একই মনোভাবের লোক ছিলো এবং কেউ কারো ক্ষতি করার চিন্তাও করতো না। কেউ কাউকে বলতো না যে তোমার বিশ্বাস এ-রকম, তোমার মনোভাব ঐ-রকম বা তোমার সংস্কার এ-রকম। আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে মুসলমানদের অন্যকোনো দল ছিলো না, ফলে সবসময় আমরা স্বস্তি বোধ করতাম। তবে একটি বিষয় আমাদের বিরক্তিতে ডুবিয়ে রাখতো। সেটি ছিলো আমাদের চারপাশের লোকদের ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব ও নিয়মনীতি। তারা গণতান্ত্রিক দল ও জাতীয়তাবাদী জোটের সদস্য ছিলো।

সেটা ছিলো পূর্বতীরবর্তী এলাকা। পূর্বতীরের অধিবাসীরা হলো এই এলাকার [শায়খ যেখানে বক্তৃতা করছেন] অধিবাসীদের মতো। বিভিন্ন গোত্রের এলাকা। আফগান জাতির মতোই তাদের ভেতর কৌলীন্যবোধ, অহংকার, পৌরুষ ও আঞ্চলিকতাবোধ ছিলো। তারা আমাদের সাদরে গ্রহণ করলো এবং তাদের বাগান আমাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলো। কারণ আমাদের ঘাঁটি তাদের তেমন বিঘ্ন ঘটায় নি। আমরা গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করতাম এবং গেরিলাদের মতোই থাকতাম। আমরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে গর্তে বসবাস করতাম। আমরা যখন গর্তে প্রবেশ করতাম তখন আমার কুরআনের এই আয়াত মনে পড়তো এবং আমি তাদের পাঠ করে শোনাতাম—

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

'তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর অনুগ্রহ বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন।' [সুরা কাহ্‌ফ : আয়াত ১৬]

জর্ডানের সীমান্তবর্তী সেনাবাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর মতো আমাদের চিনতো। তারা আমাদের শায়খ বলে সম্বোধন করতো এবং আমাদের

ঘাঁটিকে বলতো শায়খদের ঘাঁটি। তাদের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের কথা আমার মনে পড়ে। সেখানে তিনটি ব্যাটালিয়ন ছিলো। তারা সেখানকার নিম্নভূমি পাহারা দিতো। সেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের নাম ছিলো খাল্ফ রাফে। তিনি বেদুইন ছিলেন। তাঁর ভেতরে আঞ্চলিকতাবোধ ছিলো এবং আঞ্চলিকতার পৌরুষ ও গর্ব ছিলো। তিনি যখন আমাদের কাউকে সামনে পেতেন তাঁর গাড়ি থামাতেন। জিজ্ঞেস করতেন, কী খবর শায়খ? কোনো খেদমত? আমাদের তরুণতম যুবকটিও বলতো, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তারপর হেঁটে চলে আসতো। জর্ডানের সেনাবাহিনী আমাদের সম্মান করতো; অন্য লোকদের প্রতি তেমন সম্মান দেখাতো না। সত্যি কথা বলতে, অন্য লোকেরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করতো। সেনাবাহিনী পূর্বতীরের সীমান্তবর্তী এলাকায় কাজ করতো। কেউ এদিকে এলে ব্যাটালিয়ন-প্রধান তাকে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ করতেন : এই যুবক, কোথায় যাচ্ছো, কী করছো ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে ব্যাটালিয়ন-প্রধানকে যে সহযোগিতা করতো সে ছিলো ফিলিস্তিনি। সে বেচারা পড়তো বিপদে। কারণ সে চাইতো ফিলিস্তিনে জিহাদ হোক। সেনাবাহিনী যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতো তারা সাধারণত থাকতো তালিযুক্ত আলখাল্লাপরা। তারা সেসব আলখাল্লার নিচে কালাশনিকভ লুকিয়ে রাখতো। কেউ কেউ আবার গাড়িতে করেও রাশিয়ান অস্ত্র, এনএসভি হেভি মেশিনগান, গোলাবারুদ ও রকেটলাঞ্চার বহন করে নিয়ে যেতো। ব্যাটালিয়ন-প্রধান তাদের জিজ্ঞেস করতেন, কোথায় যাচ্ছো যুবকেরা? তারা বলতো, আমাদের কাজ আছে। তারা আসলে জর্ডান নদীর তীর থেকে ইসরাইলে হামলা করার চেষ্টা করতো। ব্যাটালিয়ন-প্রধান তাদের বলতেন, যদি তোমরা নদীর এ-পাড় থেকে তোমাদের কাজ না করে নদী পার হয়ে গিয়ে ও-পাড় থেকে করো তাহলে সুবিধা হয়। যুবকেরা বলতো, কী সুবিধা? ব্যাটালিয়ন-প্রধান বলতেন, আমরা তোমাদের সহযোগিতা করবো। তোমাদের রক্ষা করার চেষ্টা করবো। হামলা করার সময় কামানের গোলা নিক্ষেপ করে তোমাদের সাপোর্ট দেবো, যাতে তোমার পিছু হটে পালিয়ে আসতে পারো। প্রয়োজনে তোমাদের অস্ত্র, বোমা ও গোলাবারুদ দেবো। তোমরা যদি নদীর এ-পাড় থেকে বাতাসে হামলা করো এবং বাতাস পোড়াও তাহলে আমাদের জন্যে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আজ রাতে তোমরা হামলা চালাবে আর পরদিন সকালে ইসরাইলি বিমানবাহিনী এসে আমাদের ওপর হামলা করবে এবং আমাদেরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবে। এটা তো আমরা মেনে নিতে পারবো না।

কোনো কোনো তরুণ—যে ইসলাম বা আদব কোনোটাই জানতো না—এগিয়ে এসে বলতো, তুমি সরকারের কর্মচারী, তুমি সরকারের পক্ষেই কথা

বলছো। এখানে আমাদের ওপর তোমাদের সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তোমরা এখানে কী নিয়ন্ত্রণ করবে? আমরা এখানে ইসলামের জন্যে কাজ করছি। আমরা নোংরা কথাবার্তা বলতে বা মানুষের প্রতি বাড়াবাড়ি করতে পছন্দ করি না। ইসলাম আমাদেরকে এ-ব্যাপারে বিরত থাকতে বলেছে। ব্যাটালিয়ন-প্রধান কথা বেশি বাড়ালে সেই তরুণ তাঁর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতো। ভাবা যায়, এক সামান্য তরুণ ব্যাটালিয়ন-প্রধানের মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছে! ব্যাটালিয়ন-প্রধান আর কিছু বলতে চাইলে তরুণ তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে পজিশন নিয়ে তাঁর দিকে অস্ত্র তাক করে গুলি চালাতো এবং তাঁকে হত্যা করতো। এরপর আর কী?

আসলে সরকারের নীরব ভূমিকায় সেখানকার তরুণেরা অস্থির ও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিলো। ইসরাইল সে-এলাকায় হামলা চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিলো। তাছাড়া সেনাসদস্যরা সেসব তরুণদের সন্দেহের চোখে দেখতো এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতো। অবশ্য আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিলো ভিন্ন। আমাদের কেউ যখন কোথাও যেতো, তারা জিজ্ঞেস করতো, কোথায় যাচ্ছেন, শায়খ? আমরা বলতাম 'কাজ' আছে। তারা জিজ্ঞেস করতো, নদীর পূর্বতীরে না-কি নদীর পশ্চিমতীরে? আমরা আমাদের কাজের কথা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতাম। তারা বলতো, আপনারা সত্য বলেছেন, আপনারা যান। তারা আমাদের খুব সম্মান করতো এবং সম্মানের সঙ্গে কথা বলতো।

একটি ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে। আমরা আমাদের একটি অপারেশন নদীর পূর্বতীর থেকে পরিচালনা করেছিলাম। নদীর পশ্চিম দিকে একটি একটি ইসরাইলি বিমান টহল দিচ্ছিলো। আমরা নদীর পূর্বতীরে ওত পেতে থেকে বিমানটি রেঞ্জের ভেতরে এলে হামলা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা বিমানটি ভূপাতিত করতে পারলাম। যারা বিমানে ছিলো তারাও মারা পড়লো। ইসরাইলি বিমানবাহিনী টের পেয়ে মুহুর্মুহু হামলা শুরু করলো। তারা একই সঙ্গে বিমান থেকে বোমা এবং কামান থেকে গোলা বর্ষণ করছিলো। আমরা নদীর পূর্বতীরে টিকেও থাকতে পারছিলাম না আবার সরেও আসতে পারছিলাম না। অনবরত বিমান ও কামান হামলা চলছিলো। আমরা একটি ছোটো পুলের নিচে সন্ধ্যা পর্যন্ত লুকিয়ে রইলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের দুজন এবং সিরিয়ার দুজন আহত হলো। আল্লাহপাক তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

ব্যাটালিয়ন-প্রধান বোমা ও গোলা বর্ষণের মধ্যেই আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এবং আমাদের এক আহত ভাইকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। তিনি নিজেও আহত হলেন। আমাদের খুব বিস্ময়কর লাগছিলো, তিনি কীভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এবং নিজেকে আহত করে আমাদের এক

ভাইকে তার গাড়িতে তুলে নিলেন! তিনি তাকে নিয়ে সরাসরি শহরের হাসপাতালে চলে গেলেন।

আমার মনে পড়ে, একদিন সেনাসদস্যরা এগিয়ে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলো। তারা যখন আমাদের দেখতে পেলো চমকে উঠলো। আমরা কাঁধে করে আমাদের আহত ভাইদের ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করে নিয়ে আসছিলাম। আমরা ক্লান্তিতে ও বোঝার ভারে ন্যুব্জ ছিলাম। আমরা না আহতদের না অস্ত্রশস্ত্র কোনোটাই ঠিকমত বহন করতে পারছিলাম না। সেনারা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমাদের আহত ভাইদের ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের কাঁধে তুলে নিলো। তারা সেদিন রাতে আমাদের জন্যে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেছিলো। সত্যি কথা বলতে, আমি আমার জীবনে কখনো সেনাছাউনিতে বা যুদ্ধফ্রন্টে এমন সুস্বাদু খাবার খাই নি। অবশেষে তারা আমাদেরকে তাদের গাড়িতে চড়িয়ে আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেলো।

স্বভাবতই সেনাসদস্যরা সেখানকার বিদ্রোহী তরুণ ও আত্মোৎসর্গকারী গেরিলাদের দমন করার চেষ্টা করছিলো। আরব রাষ্ট্রগুলো গেরিলা আক্রমণ পছন্দ করে না। তাছাড়া সংবাদপত্রগুলো এ-ব্যাপারে ভুল ও মিথ্যা খবর ছাপছিলো। গেরিলাদের ভুলত্রুটিগুলো বড়ো করে প্রকাশ করছিলো। সেনাদের সঙ্গে গেরিলাদের সংঘর্ষ বেড়ে যাচ্ছিলো। তারা সেনাসদস্যদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো এবং আটকে রাখছিলো। সেনাকমান্ডাররা লিখে দিতো অমুক সেনাকে তুলে নেয়া হয়েছে। নিখোঁজ সেনার জন্যে তারা একটি নম্বর নির্ধারণ করে দিতো এবং বিভিন্ন ডিভিশনের মধ্যে সমন্বয় করে নিতো।

শেষে সেনাসদস্যদের সঙ্গে বিদ্রোহী তরুণ ও গেরিলা যোদ্ধাদের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। সেনাসদস্যরা কোনো কোনো গেরিলাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো আবার গেরিলা যোদ্ধারাও কোনো কোনো সেনাসদস্যকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু ওখানকার গেরিলাদের সুশৃঙ্খল নিয়মনীতি ছিলো না। তারা সেনাসদস্যদের ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের নাক-কান কেটে দিতো। সেনারা তাদের কাটাকান কাটানাক নিয়ে তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতো, পরিবার-পরিজনের কাছে যেতো বা সেনাবাহিনীতে ফিরে আসতো। কর্তৃপক্ষ লিখে দিতো, অমুক সেনার নাক-কান কেটে দেয়া হয়েছে এবং সে অমুক ডিভিশনের সেনা।

অবশেষে সেনাবাহিনী ক্রুধে ফুঁসে উঠলো। তারা প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করলো। প্রেসিডেন্টকে তারা জানালো, এ-অবস্থা আমরা আর সহ্য করবো না। আমরা পদত্যাগ করবো এবং নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে আত্মসম্মান বাঁচাবার চেষ্টা করবো। সেনা অফিসারদের অনেকেই তাঁদের ব্যাজ ত্যাগ করলেন। তাঁদের ক্রোধ বুক চিরে কণ্ঠনালী পর্যন্ত উঠে এসেছিলো বা তার কিছুটা নিচে ছিলো। তাঁরা এই ক্রোধকে কণ্ঠনালীর

ওপরে তুলে আনতে চাইছিলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করতে এবং শান্ত থাকতে বললেন। সেনাবাহিনী প্রতিশোধ নেয়ার কথা বললো। প্রেসিডেন্ট তখন বললেন, 'না, আমরা সবাই আত্মোৎসর্গকারী আর এরা আমাদের ভাই... ইত্যাদি ইত্যাদি।'

তার কিছুদিন পরে সেনাবাহিনীর এক সমাবেশে—যেখানে প্রেসিডেন্ট ও সেনাবাহিনীর অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খাল্‌ফ রাফে প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনারা যদি গেরিলাদের হত্যা করতে চান তাহলে আমাদের মুসলমান ভাইদেরকেই হত্যা করবেন। আপনারা মুসলমান ভাইদের হত্যা করবেন না। তারা তো ভালো মানুষ।'

তারপর পানি যেখানে গড়িয়ে যাওয়ার সেখানেই গড়ালো। প্রেসিডেন্টের রহস্যময় কথার অর্থ পরিষ্কার হয়ে উঠলো। সরকার কুরআন ছেপে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করলো। সরকার ঘোষণা করলো, এইসব গেরিলারা কাফের ও শিয়া। ওরা দেশটাকে শিয়ায় পরিপূর্ণ করে ফেলতে চায়। এরা মা-বোন ও অন্যদের মধ্যে কেনো পার্থক্য করে না। সবাই এদের কাছে সমান। এরা শিয়াদের নিয়ম অনুযায়ী মাকেও বিয়ে করে, বোনকেও বিয়ে করে।

আমি আগেই বলেছি, এই এলাকার লোকদের মধ্যে তীব্র অহংকারবোধ ছিলো, কৌলীন্যবোধ ছিলো। তাদের জন্যে এই ইশারাই যথেষ্ট ছিলো। তারপর সেনাসদস্যরা যখনই কোনো গেরিলাকে পেয়েছে তাকে হত্যা করেছে।

সেনাবাহিনী ট্যাঙ্কবহর নিয়ে তাদের ঘাঁটিতে ফিরে গেলো। তারা প্রধান ঘাঁটিতে গিয়ে জনসংযোগ শুরু করলো। সাধারণ লোকেরা বললো, গেরিলারা তো ভালো মানুষ। এরা আমাদের দীন শেখায় এবং বিভিন্ন আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। ট্যাঙ্কবহরের প্রধান বললেন, 'আমি তাদের কোনো ক্ষতি করবো না। তারা আমাদের দুজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি না করে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি শুনেছি তারা নামায পড়ে।' আসলে সেনাসদস্যরা বিশ্বাসই করতে পারতো না যে কোনো গেরিলা যোদ্ধা নামায পড়তে পারে। তারা এক গেরিলা যোদ্ধাকে নামায পড়তে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। 'তুমি গেরিলা আবার নামায পড়ছো—আমাদের তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। তুমি নামায পড়ছো আবার গেরিলা—কী করে বিশ্বাস করি।' যুবক জবাব দিলো, 'কোনো সন্দেহ নেই আমি গেরিলা। আর গেরিলারা শিয়া নয়। তারা তাদের মাকেও বিয়ে করে না, বোনকেও বিয়ে করে না। সরকার এসব মিথ্যা ছড়িয়েছে।'

তারপরও সেনাবাহিনী সরকারের নির্দেশে গেরিলাদের ওপর হামলা চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে। কেনো? একমাত্র কারণ ভয়।

আমি যখন জর্ডানের ইরবিদে[১৩] ছিলাম, তখনকার কথা মনে পড়ে। আমাদের দল ইরবিদের কাছাকাছি ছিলো। আমার পরিবার ছিল ইরবিদ শহরে। আমি তখন ছুটিতে ছিলাম এবং বাড়িতেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন হামলা শুরু হলো। আমরা বাড়ির ও এলাকার মহিলা ও শিশুদেরকে বাড়ির নিচের নিরাপত্তা-গর্তে ও বাঙ্কারে বসিয়ে দিলাম। আমরা পুরুষরা বাড়ির ভেতরেই ছিলাম। গোলা এসে বাড়ির উপর পড়ছিলো। প্রতিটা বাড়িকে তছনছ করে দিচ্ছিলো। পুরুষরা নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্যে এমন অবস্থা করছিলো যে আমার কুরআনের সেই আয়াতের কথা মনে পড়ে গেলো—

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

'তোমরা তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লালায়িত দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি হাজার বছর আয়ু দেয়া হতো; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা।' [সুরা বাকারা : আয়াত ৯৬]

আমার মনে পড়ে, আমাদের এক মদ্যপ প্রতিবেশী ছিলো। সে নিয়মিত মদ পান করতো। যখন গোলাবর্ষণ শুরু হলো, আত্মরক্ষার জন্যে সে নিজেকে মহিলাদের মাঝে ছুঁড়ে মারলো। কোন মহিলা তাকে বলছিলো 'তুই আমাদের থেকে বেরিয়ে যা' আবার কেউ তার মুখে থুথু দিচ্ছিলো; কিন্তু সে মৃতদেহের মতো সেখানে লেপ্টে রইলো। আল্লাহ সত্যই বলেছেন, তোমরা তাদেরকে জীবনের প্রতি সবচে লালায়িত পাবে। আমার পরিবার বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এলো। 'তুমি এখানে একাকী আছো, তাই আমরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এলাম'—এই কথা বলে আমার স্ত্রী আমার পাশে এসে বসলেন। কতক্ষণ পর সেই মদ্যপ লোকটি মারা গেলো। ভয়ে তার হৃদতন্ত্র ছিঁড়ে গিয়েছিলো। আমরা তার জানাযা পড়লাম।

আম্মান, ইরবিদ ও অন্যান্য শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। আরব শীর্ষ সম্মেলনে[১৪] সবাই একত্র হলেন। তাঁরা দাবি করতেন যে, ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য রাষ্ট্রকে ইসরাইলি হামলা থেকে বাঁচাবার জন্যে তাঁরা এই শীর্ষ সম্মেলন করছেন। আলবাহি আল-আদগাম[১৫], জাফর আন-নামিরি[১৬] ও সা'দ আস-সাবাহ[১৭]

---

[১৩] জর্ডানের উত্তর-পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ৪০ বর্গকিলোমিটারের একটি শহর। জর্ডান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর সংযোগস্থল। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা ও চিকিৎসার পর্যাপ্ত অবকাঠামো রয়েছে শহরটিতে।

[১৪] ১৯৭০ সালের ২১-২৭ সেপ্টেম্বর, কায়রোতে অনুষ্ঠিত।

[১৫] তিউনিসীয় রাজনীতিবিদ। ১৯৬৯-১৯৭০ মেয়াদে তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

(বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সেই হামলার সময়ে জর্ডানে এলেন। তাঁরা বাদশা, প্রধানমন্ত্রী এবং সামরিক প্রশাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন। গাড়িতে আসার সময় তাঁরা রাস্তায় হামলার শিকার হলেন। তাঁরা প্রায় মারাই পড়তেন; তাঁদের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাঁরা প্রাণে বাঁচলেন। তাঁরা জর্ডান সেনাবাহিনীকে হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ ও আহতদের বের করতে দেখলেন। এগুলো ছিলো গেরিলাদের মৃতদেহ ও আহতদেহ। সেনাবাহিনী সেগুলোকে হাসপাতাল থেকে বের করছিলো এবং দূরে নিয়ে ট্যাঙ্কের নিচে পিষে ফেলছিলো। জাফর আন-নামিরি দেশে ফিরে গেলেন এবং সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে জর্ডানের বাদশা, প্রধানমন্ত্রী ও সারা দুনিয়ার গোষ্ঠী উদ্ধার করলেন।

হামলার পরপর যে-শীর্ষ সম্মেলন হলো সেখানে আবদুন নাসেরসহ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনে গেরিলা যোদ্ধাদের ধ্বংস করার ব্যাপারে কুমন্ত্রণা দিয়েছেন বলে আবদুন নাসেরকে অভিযুক্ত করা হলো। কেউ কেউ তাঁকে লজ্জাজনক কথাও বললেন। গেরিলাদের হত্যার ষড়যন্ত্রলিপি তিনিই তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ করা হলো। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সেই ষড়যন্ত্রলিপি আবদুন নাসেরের সঙ্গেই ছিলো। তিনি সেই সম্মেলনেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সে দিনই মারা গেলেন।

হায় আবদুন নাসের! তিনি সেই সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কতো কথা বলা হতো। তিনি এই করেছেন তিনি সেই করেছেন। অথচ যখন সত্য প্রকাশিত হলো, দেখা গেলো তিনিই গেরিলাদের হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। সেই সম্মেলনেই তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলেন এবং তিন ঘণ্টা পর মারা গেলেন। দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্যেই মারা গেলেন।

আবদুন নাসেরের জানাযায় শরিক হওয়ার জন্যে প্রায় সব নেতাই এলেন। এলেন না শুধু সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল। তিনি যখন শুনলেন আবদুন নাসের গেরিলাদের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তাঁর জানাযার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকি তিনি কখনো আবদুন নাসেরের কবর যিয়ারত করতেও আসেন নি।

যাই হোক। আবদুন নাসের মারা গেলেন। তাতে মনে করা হয়েছিলো যে গেরিলারা মুক্তি পাবে এবং তাদের উপর হামলা কমে যাবে। কিন্তু কাজের

---

[১৬] জাফর মুহাম্মদ আন-নামিরি : সুদানের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট । মেয়াদকাল ২৫ মে, ১৯৬৯ - ৬ই এপ্রিল, ১৯৮৫।

[১৭] সা'দ আল-আবদুল্লাহ আস-সালিম আস-সাবাহ : কুয়েতের মন্ত্রী, পরবর্তীকালে আমির।

কাজ কিছুই হলো না। প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি আত্-তাল[১৮] বললেন, শহর ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই গেরিলাদের উপর হামলা থামাবো না। আমরা তাদেরকে জঙ্গল ও বনভূমিতে থাকতে বাধ্য করবো। আর যারা শহরে থাকতে চায় তাদেরকে অবশ্যই অশান্তিতে থাকতে হবে। তাদের নিরাপদে থাকার কোন পথই আমরা খোলা রাখবো না। তিনি গেরিলাদের আহ্বান জানালেন, হে গেরিলারা, তোমরা কি শহর থেকে বের হয়ে গিয়ে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে নিরাপদে থাকতে চাও না-কি শহরে থাকতে চাও? গেরিলারা বললো, আমরা শহর থেকে বের হয়ে যাবো। তারা শহর থেকে বের হয়ে গিয়ে জঙ্গল ও বনভূমিতে আশ্রয় নিলো। তারা আসলে সরকারের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে নি। সব গেরিলা জঙ্গলে আশ্রয় নেয়ার পর পরই জর্ডান সেনাবাহিনী তাদের উপর ট্যাঙ্ক ও বিমান হামলা চালালো এবং প্রায় সবাইকে ধ্বংস করে দিলো। আসলে শহরে গেরিলাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিলো না। তাই কৌশলে তাদেরকে একত্র করা হলো এবং বিমান ও ট্যাঙ্ক হামলা চালিয়ে শেষ করে দেয়া হলো। এই সময় গেরিলাদের একটি দল ইসরাইলে গিয়ে যোগ দিলো। তারা তাদেরকে বললো, আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই। তোমরা আরবদের চেয়ে ভলো।

জর্ডানে গেরিলা কার্যক্রমের নমুনা হলো, এখনকার মতো আমাদের একজনকেই গাড়ি চালাতে হতো। আবার সেই গুলি বহন করতো। তার পকেটে থাকতো রিভলবার আর কাঁধে থাকতো কালাশনিকভ। তখন ফিলিস্তিনের এই প্রবাদ মনে পড়ে যেতো, 'হে জমিন, যতো ইচ্ছে নড়তে পারো, আমি ছাড়া তোমার ওপর আর কেউ নেই।'[১৯]

এরপর সেখানে অস্ত্র ও গুলি বহন করা রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হলো। যে কেউ অস্ত্র ও গুলি বহন করতো সামরিক আইনের অধীনে তার বিচার হতো। সেখানকার গোপন অস্ত্রবাজারে মাইন, বোমা ও গ্রেনেড খুব অল্প দামে বিক্রি হতো। যে-দামে এক বেলা খাবার খাওয়া যেতো সে দামে

---

[১৮] ওয়াসফি আত্-তাল ২৮-০১-১৯৬২ থেকে ২৭-০৩-১৯৬৩, ১৪-০২-১৯৬৫ থেকে ০৪-০৩-১৯৬৭, ২৮-১০-১৯৭০ থেকে ২৮-১১-১৯৭১ এই তিন টার্মে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ফিলিস্তিন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। পরে জর্ডান আর্মিতে মেজর হন। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বয়রুত থেকে স্নাতক শেষ করার পর সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি ১৯১৯ সালে ইরবিদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭১ সালের ২৮ শে নভেম্বর মিসরের কায়রো হোটেলে আততায়ীদের হাতে নিহত হন। আম্মানে তাঁকে দাফন করা হয়।

[১৯] এটি একটি ফিলিস্তিনি প্রবাদ। অহংকার নিয়ে চলাফেরা-করা ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথা বলা হয়।

মাইন বা গ্রেনেড কেনা যেতো। চার রিয়াল বা বিশ রুপি দিয়ে পনের কেজি ওজনের বিস্ফোরকও কেনা যেতো। গেরিলারা এসব মাইন ও গ্রেনেড সেনাবাহিনীর ট্যাংকের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতো।

আমরা—মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটি দল—এই সুযোগ কাজে লাগাতাম। অবশিষ্ট মুসলমানরা এটা থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু আমরাও যখন এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম, আমাদের খুব দুঃখ ও অনুশোচনা হতো। এই সুযোগ ব্যবহার করে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম, অনেক কিছু শিখতে পারতাম। আসলে অস্ত্র ছাড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অস্ত্র ছাড়া জিহাদে বের হওয়া পুরুষ আর ঘরে বসে থাকা নারীর মধ্যে তেমন ব্যবধান নেই। অস্ত্র নেই মানে কিছুই নেই।

যারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতো, নিজেদের মুসলমানিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতো এবং শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করতো, সরকার প্রথমে তাদের 'নড়াচড়া' বন্ধ করলো। তাদের কথা বলা বন্ধ করলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের শিক্ষাদানও নিষিদ্ধ করলো। এখানেই শেষ নয়, এসব মুসলমান শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে তুমুল সমালোচনা হলো এবং তাদেরকে শিক্ষাকার্যক্রম থেকে ছাটাই করা হলো। এরপর সেনাবাহিনীকে মুসলমান-মুক্ত করার পাঁয়তারা শুরু হলো। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছুই করা গেলো না। কারণ অস্ত্র নেই। এটা অসহায় বকরির মতো অবস্থা। আল্লাহর রহমত যে জায়গায় আছে সেটা ছাড়া পুরো আরব বিশ্বেই এই অবস্থা।

আমরা অনুশোচনা করলাম, নিজেদের ধিক্কার দিলাম। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের অভাবই আমাদের ঘায়েল করলো। আমাদের গ্রুপের সত্তর জনের নয়জন ছাড়া বাকি সবাই চলে গেলো। তারা সবাই কাগজ ও কলম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা জিহাদের কথা লিখে ও বলে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু জিহাদের স্বাদ কাগজ ও কলমে পাওয়া যায় না। জিহাদের প্রকৃত স্বাদ তিনিই পান, যাঁর রয়েছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং যিনি আগুনের হলকা কাঁধে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ঘুরে বেড়ান।

আল্লাহর নেয়ামত, আমি জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয়। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে। আমি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি। সামরিক জান্তা ও প্রধানমন্ত্রী চব্বিশটি অথবা সাতাশটি—আমি ভুলে গেছি—কারণ দর্শিয়ে আমাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা না-কি আমার সন্তুষ্টির জন্যেই এ কাজটি করেন! প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ আয্‌যামকে বরখাস্ত করে তাঁকে মক্কায় যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছি। তিনি সেখানে হজ পালন করতে পারবেন।'

এভাবেই আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং মক্কায় গিয়ে হজ করার সুযোগ প্রদান করা হয়।[২০]

আমি আফগানিস্তানে চলে এলাম। আমি নিজেকে মুক্ত ও স্বস্তি বোধ করলাম। তখন ইয়ামেন ও আফগানিস্তানে জিহাদ চলছিলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম জিহাদে অংশগ্রহণ করবো। আফগানিস্তান বা ইয়ামেন কোন একটি এলাকায় জিহাদে যোগ দেবো। জিহাদে যোগ দেবার প্রবল বাসনা ভেতরে ভেতরে অবদমিত হয়ে উঠছিলো। আমি আমার বাসনাকে বাস্তবে রূপদান করার কথা ভাবছিলাম। জিহাদের ময়দানে যে-আশ্চর্য স্বস্তি, গভীর প্রশান্তি, স্থিরচিত্ততা ও কষ্ট সহ্য করার দৃঢ় মনোবল পাওয়া যায় অন্য কোথাও সেটা অনুপস্থিত। ঠিক তখনই পেশোয়ার থেকে একটি চিঠি এলো। তারা জানালেন যে, অফিসিয়াল ও অন্যান্য কাজের জন্যে আমার সেখানে উপস্থিত থাকা জরুরি। বিষয়টি আমাকে খুবই দুঃখ দিলো।

আমরা এমন এক নেয়ামতের ভেতর রয়েছি যার জন্যে হয়তো আগামী দিনে আমাদেরকে রক্তাশ্রু ঝরাতে হবে। আমরা আশা করি, আল্লাহপাক আমাদেরকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেনো আমাদেরকে এই নেয়ামত থেকে মাহরুম না করেন। আল্লাহপাকের কসম, সেই প্রকৃত মাহরুম যে জিহাদের নেয়ামত থেকে মাহরুম হয়েছে। ঈমানের নেয়ামত এবং জিহাদের নেয়ামত থেকে যারা মাহরুম হয়েছে তাদের মতো মাহরুম আর কেউ নেই। তাদের চেয়েও বড়ো মাহরুম হলো যারা জিহাদের ভূমিতে গিয়ে জিহাদ না করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। আল্লাহপাকের কসম, আমি এদের জন্যে কতো দুঃখ করেছি, কতো শোক প্রকাশ করেছি। এই সব মিসকিনদের জন্যে কতো কেঁদেছি। এরা অনেক কষ্ট সহ্য করে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কয়েক বছর চেষ্টা করে জিহাদের এই ভূমিতে পৌঁছে। তারপর এদের ভিমরতি ঘটে। এদের মাথায় এই কুমন্ত্রণা কাজ করে যে, আমরা এখানে এসেছি আর এরা হলো মুশরিক। তাদের ভেতর শির্‌ক বিদআত দুটোই রয়েছে। তাদের সঙ্গে জিহাদ করা জায়েয হবে না ভেবে তারা ফিরে যায়। ফলে তারা জিহাদের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

---

[২০] শায়খ আবদুল্লাহ আয্‌যাম রহ. ১৯৭৩-১৯৮০ সালে জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৮০-১৯৮১ সালে কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এ-বছরই ইসলামাবাদের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসে। এখানে কিছুদিন ছিলেন। এরপর আফগানিস্তানের কাজে মনোনিবেশ করেন।

জিহাদের আবশ্যকতা হজের আবশ্যকতা থেকে অগ্রবর্তী

আলেমগণ বলেন, যে-পাথেয় ও সওয়ারির অধিকারী হলো এবং হজকে এক বছর পিছিয়ে দিলো সে যদি সেই বছর মারা যায় তাহলে সে হজ আদায় না করার গুনাহগার হয়ে মারা যাবে। হজ করতে যাওয়ার জন্যে টিকেট কেনার সামর্থ্য যার থাকবে তাকে সে বছরেই হজ করতে হবে। সে যদি বিলম্ব করে এবং মারা যায় তাহলে সে গুনাহগার হবে। আবার কোন কোন আলেম বলেন, হজ বিলম্বে আদায় করাও জায়েয আছে। তাড়াহুড়ো না করলেও চলবে। কিন্তু জিহাদ ফরজ হলে তাৎক্ষণিকভাবে জিহাদে যোগদান করতে হবে। এখানে বিলম্বের অবকাশ নেই। এটা এমন নয় যে, আজ জিহাদ শুরু হলো, দশ বছর চলতে থাকবে, আমি দশ বছর পরে যোগ দেবো। জিহাদ থেকে বঞ্চিত হলে, এর চেয়ে বঞ্চনা ও এর চেয়ে বিপদ আর কিছু নেই। এর চেয়ে নাফরমানি, এর চেয়ে পাপের কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

অনেকে অনেক অজুহাত পেশ করে, অনেক কারণ দর্শায়। প্রতিকূল অবস্থার কথা বলে। তারাই আবার যারা জিহাদে যোগ দেয় তাদেরকে অবিবেচক, আবেগপ্রবণ, অপরিণামদর্শী বলে থাকে। তারা আবার জ্ঞানী ও হুকুমদাতা। অবশ্য বর্তমানে জ্ঞানের ভিন্ন অর্থ দাঁড়িয়েছে। কবি আবু তায়্যিব আল-মুতানাব্বির ভাষায়—

يرى الجبناء أن الجبن عقل   و تلك خديعة الطبع اللئيم

'ভীরুরা মনে করে ভীরুতাই জ্ঞান; অথচ তা নিকৃষ্ট স্বভাবের প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।'[২১]

হয়তো তারা ভাবছে তারা সঠিক কাজ করছে এবং পুণ্যের কাজ করছে। কিন্তু তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে। তারা যা করে তাতে হয়তো স্বস্তি বা তৃপ্তি পায় না। অতৃপ্তি নিয়েই তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং ভাবে তারা বিরাট সোয়াবের কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলতে চাই, এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা না-করা, কারো সমালোচনা করা বা কোন ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করা সাহাবি এবং তাবেয়িদের অনুসরণেই করতে হবে। নিজেদের মর্জি মতো কাজ করতে গেলে আমরা ভ্রান্তির শিকার হবো এবং সাফল্য ও কল্যাণ অর্জন করতে পারবো না। সাহাবিরা কখন কিভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তা আমরা জানি। তারা সর্বাত্মকভাবে কতোগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাও আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। ইতিহাসে

---

[২১] এটি একটি দীর্ঘ কবিতার পঙ্‌ক্তি; ভীরুদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে রচিত।

সাহাবিদের বর্ণনাতেই রয়েছে, তাঁদের অনেকেই প্রায় সব যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছেন।

সাহাবিদের কেউ কেউ গর্ব করে বলেছেন, আমি রাসুল সা.-এর সঙ্গে সব যুদ্ধেই উপস্থিত ছিলাম। এমন হয় নি যে জিহাদের ডাক এসেছে আর তাঁরা ঘরে বসে আছেন। যারা বেশি বোঝে তাদের চোখে আজ জিহাদ দোষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ মিসকিন ছাড়া আর কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করে না। ১৯৬৭ সালে এমনই ঘটেছিলো। মুসলমানরা ঘরে বসেছিলো। আরব বিশ্বে দুইবছরব্যাপী ইসলামি আন্দোলন হয়েছিলো। 'হে মুসলমানরা, তোমরা জেগে ওঠো। হে মুসলমানরা, তোমরা ফিলিস্তিনে আসো। হে মুসলমানরা, তোমরা পবিত্র ভূমিতে আসো। হে মুসলমানরা, তোমরা মসজিদুল আকসায় আসো, তোমরা পশ্চিম তীরে আসো।' মুসলমানরা সাড়া দেয় নি। হয়তো মুসলমানদের সাড়া না দেয়ার ফলেই আজ মক্কা-মদিনার পথ ষড়যন্ত্রকারীদের জন্যে উন্মুক্ত হয়েছে। কবির ভাষায়—

لقد أسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي

'যদি তুমি কোনো জীবিতকে ডাকতে তাহলে সে তোমার ডাকে সাড়া দিতো; কিন্তু তুমি যাকে ডাকছো তার তো জীবন নেই।'[২২]

আল কুরআনের ভাষায়—

إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

'তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না এবং বধিরকে শোনাতে পারবে না তোমার আহ্বান, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পশ্চাদ্‌ধাবন করেছে।' [সুরা নামল : আয়াত ৮০]

কবির ভাষায়:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

'যে মারা গেছে সে তো মৃত নয়, সে বিশ্রামে আছে; প্রকৃত মৃত সেই যে জীবন্মৃত।'[২৩]

---

[২২] কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি : (وَلَوْ ناراً نَفَخْتَ بها اضاءتْ + ولكن انْتَ تَنْفُخُ في رَمَادِ) 'তুমি যদি আগুনে ফুঁ দিতে তাহলে তা জ্বলে উঠতো; কিন্তু তুমি তো ফুঁ দিচ্ছো ছাইয়ে।'

[২৩] কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি : (إنما الميت من يعيش كئيباً + كاسف باله قليل الرجاء) 'মৃত তো সেই যে যাপন করে নিরাশার জীবন; যার হৃদয় হতাশাগ্রস্ত এবং যার আশা তুচ্ছ।' পঙ্‌ক্তিদুটি ইবনুর রালা আদ-দাবাবির কবিতার অংশ। বিস্তরিত দেখুন : আত-তারিখ, ইবনুল আসির, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬।

মুসলিম বিশ্বের কাছে দাবি

আমি পাকিস্তানে আসার পর তিনবছরব্যাপী বিশ্বভ্রমণ করেছি এবং তাদেরকে আফগানিস্তানের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস হচ্ছিলো না, একটি মুসলিম জাতি যুদ্ধের ময়দানে রয়েছে; তারা একটি উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং জিহাদের মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করছে আর আরব মুসলমানরা ঘুমিয়ে রয়েছে। তারা ভাবছে, তারা আল্লাহর দীনের খেদমত করে যাচ্ছে। আমি সৌদি আরবে গেলাম, জর্ডানে গেলাম, আমেরিকা ও ব্রিটেনে গেলাম। আমি মুসলমানদেরকে বললাম, একটি সম্পূর্ণ জাতি অস্ত্র বহন করছে এবং ইসলামি আন্দোলন তাদেরকে পরিচালনা করছে। ইসলামি আন্দোলনের নেতারা এবং ইসলামি দাওয়াতের সন্তানেরা তাদের শেকড় থেকেই ইসলামের উপর রয়েছেন। তারা একটি জাতিকে পরিচালনা করছেন এবং একটি দুষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সঙ্গে রয়েছেন। আপনারা কি বিশ্বাস করছেন? তারা বললো, আরে, এই মিসকিন শায়খ আবদুল্লাহ বলে কী? মনে হয় সে উত্তেজিত না হয় বোঝে বেশি। আমি মিসকিন বলেই হয়তো আমার চেহারা রক্তিম হয়ে ওঠে নি এবং ক্রোধে আমার চেহারা পাল্টে যায় নি। কবিতা :

أتسبى المسلمات بكل ثغر   وعيش المسلمين إذا يطيب

أما لله والإسلام حق   يدافع عنه شبان وشيب

فقل لذوي البصائر حيث كانوا   أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا

'সীমান্তে ও উপসাগরে মুসলিম নারীদের বন্দি করে রাখা হবে আর মুসলমানরা সুখে বাস করবে? শুনে রাখো, তোমাদের ওপর আল্লাহ ও ইসলামের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার রক্ষা করা যুবক-বৃদ্ধ সবার দায়িত্ব। তুমি চক্ষুষ্মানদের বলো—তারা যেখানেই আছে এবং যে-দায়িত্বেই আছে—তোমরা সাড়া দাও, তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।'[২৪]

---

[২৪] এই কবিতায় রচয়িতা অজ্ঞাত। এই পঙ্‌ক্তি তিনটি কবিতার শেষ অংশের; শুরুর পঙ্‌ক্তিগুলো এমন :

أحل الكفر بالإسلام ضيماً + يطول عليه للدين النحيب

فحق ضائع وحمى مباح + وسيف قاطع ودم صبيب

وكم من مسلم أمسى سليباً + ومسلمة لها حرم سليب

وكم من مسجد جعلوه ديراً + على محرابه نصب الصليب

এই তিন বছরে আমি পেশোয়ারের নেতাদেরও বোঝানোর চেষ্টা করেছি। অবশ্য এখানে একটি সংগঠন ছিলো। সংগঠনটির নাম ছিলো الإتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان 'আফগান মুজাহিদদের ইসলামি জোট'। আমি মুসলমানদের আহ্বান জানালাম তারা যেনো এই সংগঠনে যোগ দেয় এবং সংগঠনটিকে বাঁচিয়ে রাখে। কেউ কেউ হয়তো আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং এই সংগঠনে যোগ দিয়ে কাজ করে গেছে।

কৌশল পরিবর্তন

আমি বললাম, আমরা পেশোয়ারে বসে আছি কেনো? আরব থেকে লোকেরা আসছিলো। তারা একসঙ্গে থাকলেও তাদের ভেতর বিভিন্ন গ্রুপ ছিলো। কারো ভেতর আফগানিস্তানে জিহাদ করার মনোভাব ছিলো আবার কারো ভেতর এই মনোভাব ছিলো না। অনেকে আবার পরস্পরের সমালোচনাও করতো। কেউ একটি দলে যোগ দিলে অপর দলের বিরুদ্ধে কথা বলতো। একটি সংগঠনে যোগ দিলে অপর সংগঠনের সমালোচনা করতো। অধিকাংশ আরব তিনদিন বা একসপ্তাহ থাকতো আবার কেউ কেউ একমাসও অবস্থান করতো। তারপর ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে যেতো। আমি বললাম, যারা আরব থেকে এসেছে এবং আফগান ভাইদের থেকে দূরে রয়েছে আমরা তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে চাই। তারা হয়তো যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তাদের সংকল্প বাস্তবায়ন করতে পারছে না। সময়-সুযোগ মতো আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে চাই। আমরা তাদেরকে বোঝাবো যে, এই জিহাদই পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামি জিহাদ। তারপর আমরা তাদেরকে আফগানিস্তানের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেবো। তারা আফগানিস্তানের ভেতরে তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা একটি অফিস খুলে ফেললাম। অফিসের নাম দিলাম মাকতাবুল খেদমাহ্ বা সেবা-দপ্তর। মাকতাবুল খেদমাহ্ এই কারণে যে, আমরা মুজাহিদদের এবং যারা মুজাহিদদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে তাদের খেদমত করবো। আরব থেকে যারা আসবে তাদের প্রত্যেকের জন্যে আমরা এই মহান ইবাদতকে সহজ করার দায়িত্ব কাঁধে নিলাম। আমরা তাদেরকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসবো। তাদের জন্যে সম্মেলনের ব্যবস্থা করবো এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবো। তাদেরকে

دم الخنزير فيه لهم خلوق + وتحريق المصاحف فيه طيب
أمور لو تاملهن طفل + لطفّل في عوارضه المشيب

গাড়িতে করে পেশোয়ারে নিয়ে আসবো তারপর প্রশিক্ষণ শিবিরে পাঠিয়ে দেবো। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর তাদেরকে ভাগ ভাগ করে আফগানিস্তানে পাঠাবো। আমরা যা চিন্তা করেছি তা হলো আরব থেকে আগত মুজাহিদদের এভাবে দায়-দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আফগানিস্ত ানের ভেতরে প্রবেশ করার পর আমাদের কর্মপন্থা কী হবে তাই আমরা প্রথমে ভেবেছি। আমাদের পরিকল্পনা ছিলো নিম্নরূপ :

১. আমরা আফগান জিহাদের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করার চেষ্টা করবো। পেশোয়ারে আমাদেরকে যা বলা হয়েছে তা কি আসলেই বাস্তব না বাস্তব নয়?
২. আফগানিস্তানের ভেতরে বিভিন্ন ফ্রন্ট এবং সেখানে যারা কাজ করছে তাদের অবস্থা কী?
৩. আরব যুবকদের মধ্যে যারা শাহাদাত-পিপাসু তারা তাদের শাহাদাতের পিপাসা তৃপ্ত করবে। আল্লাহপাক যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করেন এবং তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন।
৪. তারপর আমাদের হাতে যে-সহায়তা রয়েছে তা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেবো।

অপ্রত্যাশিত ব্যাপার

আরবরা আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। তাদের উদ্দেশ্যগুলো আমার মাথায় ছিলো। আমি ভাবলাম আফগানিস্তানে তাদের অনেক কাজ রয়েছে। তারা বিপুল কাজকর্ম আঞ্জাম দেবে এবং পীড়িত এলাকাগুলোকে সজীব করে তুলবে।

আফগানরা যখন শুনলো তাদের এলাকায় আরবরা প্রবেশ করছে, তারা তাদের দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো। তারা আরবদের স্বাগত জানানোর জন্যে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এলো। আশি, নব্বই, একশো বছরের বৃদ্ধরা এলো, তরুণ-যুবারা এলো, এমনকি শিশু-কিশোররাও এলো। তারা আরব মেহমানদের আসবাবপত্র ও মালসামানা বহন করে নিয়ে চললো। ছোটো ছোটো ছেলেরাও যার যার সাধ্যমতো জিনিস বহন করে নিয়ে চললো। বরফঢাকা পথ, পাথুরে পথ পাড়ি দিয়ে তারা তিন-চার দিন হেঁটে তাদের গন্ত ব্যে পৌঁছলো। আরবরা তাদেরকে কুরআন পড়ে শোনালো। ছোটোদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। আদর করলো। আফগানরা বাড়িতে ফিরে গিয়ে গর্বে সঙ্গের বললো, আমরা আরবদের দেখেছি। তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে এসেছি। যখনই কোনো আফগান কোনো আরবকে দেখতো তাদেরকে জড়িয়ে ধরতো। 'হে আল্লাহর রাসুলের নাতি' বলে তাদের সম্বোধন করতো।

তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করে বলতো, তোমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্যে এসেছো।

আরবরা যে-পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিলো—আফগান জনগণের কাছে বিভিন্ন সহায়তা পৌঁছে দেয়া—এই পরিকল্পনার চেয়েও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাদের সামনে ছিলো তা হলো আফগান জনগণের শিক্ষা, তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল চাঙ্গা করা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় আন্দোলন সৃষ্টি করা। অনেক এলাকা আরবদের অপেক্ষায় ছিলো যে তারা সেখানে আসবে এবং কার্যক্রম শুরু করবে। কিন্তু আরবরা গুলি চালানোর জন্যে অস্থির ছিলো। 'কোথায় অপারেশন', 'কোথায় যুদ্ধক্ষেত্র', 'আমরা শাহাদাত বরণ করতে চাই', 'কোথায় আয়তলোচনা হুর', এইসব বলে তারা হাহাকার করে উঠলো। তারা কমান্ডারকে একবার, দুইবার এবং বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কমান্ডার যদি কোনো অপারেশনের পরিকল্পনা করেন তাহলে তারা সেটা বাস্তবায়ন করবে। আর আমাদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো অপারেশন অব্যাহত রাখা। শত্রুদের নিশ্বাস ফেলারও সুযোগ না দেয়ার পরিকল্পনা আমাদের ছিলো। আমরা তাদেরকে মরণকামড় দিয়ে ধরতে চেয়েছিলাম, যাতে তারা এক মুহূর্তের জন্যে স্বস্তিতে থাকতে না পারে।

তারপরও আমাদের মনে হয়েছিলো, আরবদের জন্যে উপযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আফগান জনগণের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, আত্মবিশ্বাসে তাদেরকে বলীয়ান করা।। কারণ আফগানিস্তানে যুগযুগ ধরে যুদ্ধ চলছে। এসব এলাকার আলেমগণ ও আল্লাহর পথের দায়িগণ আগেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ফলে পরবর্তী বংশধর মূর্খ হয়ে পড়ে। নেতৃত্বের যোগ্যতা দূরে থাকুক সাধারণ ইসলামি জ্ঞানও তাদের ছিলো না। আফগানিস্তানে এমন অনেক এলাকা ছিলো যেখানকার লোকেরা সুরা ফালাক সুরা নাসও জানতো না। আরবদের কাছে একসময় অনুভূত হয় যে তাদের আবশ্যক কর্তব্য হলো আফগানদের শিক্ষাদান করা। তাদেরকে কুরআনের শিক্ষাদান করা। কারণ আফগানদের হৃদয়ে প্রবেশের একমাত্র চাবি হলো আল কুরআন। তাই যে-যুবকই কুরআনের মাধ্যমে তাদের মাঝে প্রবেশ করেছে তারা তাকে বরণ করে নিয়েছে। তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে। আমি ভাই সাঈদ আল-জাযায়েরি এবং ভাই আবু আসেম সম্পর্কে অন্যত্র লিখেছি। আবু আসেম আহমদ শাহ মাসউদের কাছে যান। আহমদ শাহ মাসউদ আবু আসেমের কাছে তিরিশজন কমান্ডারকে অর্পণ করেন। এই কমান্ডারগণ রুশ বাহিনীকে পরাস্ত করেছিলেন। তারা কয়েক বছরে রুশ বাহিনীর চারশো-পাঁচশো ট্যাঙ্ক চূর্ণবিচূর্ণ করেছিলেন। আর আহমদ শাহ মাসউদ তাদেরকেই কুরআন শেখার জন্যে আবু আসেমের নিকট অর্পণ করলেন। আবু আসেম তাদের মাঝে

একবছর ছিলেন। আমি এই কমান্ডারদের একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবু আসেম কেমন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা আহমদ শাহ মাসউদকে আশ্চর্যরকম ভালোবাসি। কিন্তু আবু আসেমের জন্যে আমাদের যে ভালোবাসা- তার কাছে এই ভালোবাসা তুচ্ছ। তিনি আমাদের হৃদয়ের সিংহাসনে সবসময় ভাস্বর ছিলেন। এই কমান্ডার আরো বললেন, আমি আবু আসেমের মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষ আর দেখি নি। আমাদের কেউ তাঁর সামনে পা ছড়িয়ে বসার সাহস পেতো না। তাঁর দাড়ি নিয়ে কৌতুক করা, তাঁর সামনে মুচকি হাসা বা ঠাট্টা-তামাশা করার সাহস কারো ছিলো না। হায় আল্লাহ! তাঁর বয়স ছিলো মাত্র তেইশ বছর বা চব্বিশ বছর। তাঁর গলার স্বর ছিলো সুমধুর। আবু হাজের জামিল ও আবু ইয়াহইয়া জামিলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর তুলনা করা যায়। তিনি আমাদের কুরআন মুখস্থ করাতেন এবং দিক-নির্দেশনামূলক শিক্ষাদান করতেন।

তিরিশজন কমান্ডার, যাঁরা ছিলেন পরিচিত, রুশ বাহিনীকে ব্যর্থ ও অস্থির করে রাখার কারণে যাঁরা ছিলেন তাদের ত্রাস এবং যাদের ব্যাপারে রাশিয়া উপাধি প্রয়োগ করেছিলো তারাই কুরআন শেখার জন্যে যুবক আবু আসেমের ছাত্র হলেন। আবু আসেম দীর্ঘদিন তাঁদের মাঝে থাকতে পারেন নি। তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন। তাঁর শাহাদাত বরণের ঘটনা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আশ্চর্য ঘটনা। যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হওয়ার দিন সকালে আবু আসেম লিখে রেখেছিলেন যে তিনি শহীদ হবেন। তাদের দলে একশো সতেরো জন মুজাহিদ ছিলেন। তাদের মধ্যে মাত্র দুইজন সেদিন রোযা রেখেছিলেন—আবু আসেম আর শাহ কলন্দর। সেদিন শহীদও হয়েছিলেন দুইজন—শুধু দুই রোযাদার—আবু আসেম আর শাহ কলন্দর।

সফিউল্লাহও লিখে রেখেছিলেন যে তিনি শহীদ হবেন। আবদুল্লাহ আনাস, বর্তমানে আহমদ শাহ মাসউদের উপদেষ্টা, তাঁকে বললেন, 'আমরা এখানে দুইজন আরব আছি। আমাদের একজন আজ শহীদ হবে। আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, আমাদের একজন আজ শহীদ হবে।' সফিউল্লাহ তাঁকে বললেন, 'আপনি আল্লাহর নামে কসম খাচ্ছেন। আপনি কি আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছেন?' আনাস বললেন, 'আমি আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করছি না। আমি শুধু কসম খেয়ে বলছি, একজন অবশ্যই শহীদ হবে। আমি গায়েব জানি না। আপনি কি অন্ধ? আপনি কি তার চেহারায় শাহাদাতের নুর দেখতে পান নি?'

আবু আসেম শহীদ হয়ে ফিরে এলেন। সবাই কুরআন পাঠের মজলিসে বসলেন। আবু আসেমের জায়গাটা খালি। তাঁরা সেই খালি জায়গার দিকে তাকিয়ে হুহু করে কেঁদে উঠলেন।

কাবুল থেকে বায়তুল মাক্দিস : এক

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের নফসের অনিষ্টতা থেকে এবং আমাদের কাজের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহপাক যাকে সরল পথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সরল পথে পরিচালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সা. আল্লাহপাকের বান্দা ও তাঁর রাসুল। তিনি তাঁর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন এবং উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আমাদের নেতা মুহাম্মদ সা., তাঁর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গীদের ওপর আল্লাহপাক রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহপাকের কাছে পানাহ চাই। আল্লাহপাক এরশাদ করেন—

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ () وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ () وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ()

'আল্লাহপাক কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কেনো পথপ্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তার জন্যে কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই; আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন? তুমি যদি এদের জিজ্ঞেস করো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? এরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলো, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে। বলো, আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে।' [সুরা যুমার : আয়াত ৩৬-৩৮]

বিশ্বাস ও রক্তের অভিন্নতা

রক্তাক্ত কাবুলের যে কাহিনি, আক্রান্ত ফিলিস্তিনের কসাইখানার একই কাহিনি। যে-রক্ত হিন্দুকুশে প্রবাহিত হচ্ছে সেই একই রক্ত গাজায় শুকাচ্ছে। হেলমান্দ, বালখ ও হেরাতে সন্তানহারা আর বিধবাদের যে-বিলাপ শোনা যায়, শোনা যায় যে-হাহাকার একই বিলাপ আর একই হাহাকার শোনা যায় নাবলুস, উম্মে নুর, খলিল ও জেরুজালেমে। তা একই কাহিনি; আক্রান্ত ইসলামের কাহিনি—যে-ইসলামের ওপর পুরো বিশ্ব ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই দীনের কাহিনি—যে-দীনের ওপর গোটা দুনিয়া আক্রমণ করেছে। হিংস্র খাদকদের কাহিনি—যে-খাদকেরা মুসলমানের দস্তরখানে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধিই করে চলছে।

জিহাদ যখন থেমে যায়, শত্রুর অন্তর থেকে যখন ভয় দূর হয়ে যায় এবং মুসলমানদের অন্তরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় তখন উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যায় এবং খড়কুটায় পরিণত হয়। তাদের 'সমগ্রতা' অর্থহীনতা ছাড়া আর কিছু বোঝায় না। মনে রাখুন, যেদিন তরবারি খাপমুক্ত হবে, যেদিন হাতে হাতে ঝলকে উঠবে কৃপাণ, যেদিন শোনা যাবে অস্ত্রের ঝনঝনানি, সেদিনই কেবল শেয়ালেরা তাদের গর্তে আশ্রয় নেবে।

এই দীন সর্বশ্রেষ্ঠ দীন। বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দীন। আমাদের রব আমাদের জন্যে আমাদের রাসুলকে প্রেরণ করেছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'আমি কেয়ামতের পূর্বে তরবারি হাতে প্রেরিত হয়েছি, যাতে এক আল্লাহর এবাদত করা হয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমার বর্শার ছায়ায় আমার রিযিক নির্ধারিত আছে। যে আমার নির্দেশ অমান্য করবে তার জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা। যে যে-দলের অনুকরণ করবে সে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত।'[২৫]

তরবারি ছাড়া তাওহিদ রক্ষা করা যায় না

এই দীন তরবারির মাধ্যমে এসেছে, তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তরবারির মাধ্যমেই টিকে থাকবে। তরবারি যখন খোয়া যাবে, নষ্ট হবে—

---

[২৫] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ৫১১৫, ৫৬৬৭; কানযুল উম্মাল, হাদিস ১০৫২৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৪০৩১।

এই দীনও নষ্ট হবে। এই ধর্ম শক্তির ধর্ম, শৌর্যবীর্যের ধর্ম। এই ধর্ম ভীতির ধর্ম। এই ধর্ম নেতৃত্ব ও অভিযানের ধর্ম। এই ধর্ম সম্মান ও মর্যাদার ধর্ম। ভীরুতার এখানে স্থান নেই এবং দুর্বলতা এখানে অপরাধ। ভীরু ও দুর্বল জাহান্নামের উপযুক্ত। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'নিশ্চয় তারা ঐ সমস্ত লোক ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটাবে নিজেদের প্রতি জুলুম করা অবস্থায় এবং ফেরেশতারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে- তোমরা কেমন ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়াতে নিজেদেরকে দুর্বল মনে করেছিলাম। ফেরেশতারা বলবে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিলো না যে তোমরা তাতে হিজরত করতে পারো? সুতরাং তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। সেটা কতোই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।' [সুরা নিসা : আয়াত ৯৭]

সুতরাং 'দুর্বলতা' আল্লাহর কাছে আপত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। নিশ্চয় তা কঠিন অপরাধ; অপরাধী অবশ্যই জাহান্নামের উপযুক্ত। তবে আল্লাহপাক যাদেরকে ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা ভিন্ন। তারা হলো অন্ধ, খোঁড়া ও অসুস্থ। এরপর আল্লাহপাক এরশাদ করেন—

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

'তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারে না এবং যারা সামনে কোনো পথ পায় না (তাদের কথা ভিন্ন)। অচিরেই আল্লাহপাক তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।' [সুরা নিসা : আয়াত ৯৮-৯৯]

আমরা কিছুতেই তোতলামি করছি না বা আবোলতাবোল বকছি না। আমরা যা বলছি স্পষ্ট করে বলছি। আমরা আমাদের দীনকে মানবিকতার কল্যাণে অগ্রগামী করতে চাই। নিশ্চয় এই দীন সমস্ত মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছে। গোটা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের জন্যে এসেছে। মানুষকে উদ্ধার জন্যে এই দীন এসেছে বলতে পৃথিবীর সব মানুষকেই বোঝায়। 'মানুষ' বলতে আমরা পৃথিবীর সব মানুষকেই বুঝি। আমরা বলতে লজ্জাবোধ করবো না যে, নিশ্চয় আমাদের দীন আমাদের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করতে আদেশ দিয়েছে। এবং শত্রুকে আক্রমণ করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফরয। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন—

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

'তোমরা তাদেরকে (তোমাদের ও আল্লাহর শত্রুদের) মোকাবিলা করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তারা ব্যতীত অন্যদেরকে যাদের কথা তোমরা জানো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' [সুরা আনফাল : আয়াত ৬০]
আমাদের এই নীতি কখনো প্রভাবিত হবে না এবং বর্তমান সময়ে নিপীড়ন-নিষ্পেষণ সত্ত্বেও দীনের ক্ষেত্রে পরাজিত মুসলিম সন্তান-সন্ততির স্বভাবে কোনো পরিবর্তন আসবে না। যদিও ধূর্ত পশ্চিমা শক্তি গত তিন শতাব্দী ধরে জিহাদের এবাদত ও এর আকিদার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বলে, তোমাদের ধর্ম তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা বলি, আমাদের ধর্ম ভালোবাসা ও শান্তির ধর্ম এবং বিশ্বনিখিলের জন্যে রহমত। কিন্তু এই ধর্ম তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তরবারির মাধ্যমেই রক্ষিত হবে। কারণ তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) তরবারি ছাড়া রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর আমাদের নবী তরবারি হাতে প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা বলে, তোমরা সন্ত্রাসী। আমরা বলি, আমরা বিশ্বজগতের জন্যে শান্তি। আমরা কেবল এই দীনের- ইসলামের শত্রুদের জন্যে ত্রাস; অন্য কারো জন্যে নয়। আমরা কেবল তাদের জন্যেই ভীতিকর যারা আমাদের উদ্দেশ্যকে ভণ্ডুল করতে চায়, আমাদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে চায় এবং আমাদের দীনকে মানবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করতে চায়।

ইসলাম প্রতিরক্ষামূলক ধর্ম নয়

যাঁরা এই দীনের সম্পর্কে লিখেছেন, বর্তমান সময়ে নিপীড়িত মুসলিম বংশধরদের জিহাদের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন—যদিও তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি বহন করেন, তবু তাঁরা লিখেছেন—এই ধর্ম প্রতিরক্ষামূলক ধর্ম! হায়, এই ধর্ম কীসের প্রতিরক্ষা করবে?! এই দীন কি আরব ভূখণ্ডকে রক্ষা করবে না-কি আরব উপদ্বীপকে রক্ষা করবে! কীসের প্রতিরক্ষা করবে? যদি তাঁরা বলেন, এই দীন রক্ষা করে মানুষকে এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও নীতিমালাকে তাহলে তো কথা নেই। কিন্তু যদি বলেন, এই দীন কোনো ভূখণ্ডের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা তাহলে তাদের এটা

কেমন জ্ঞান! আফসোস তাদের এই জ্ঞানের প্রতি! যদি রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দীনকে প্রতিরক্ষামূলক মনে করতেন, যদি হযরত আবু বকর ও উমর রা. এই দীনকে প্রতিরক্ষামূলক মনে করতেন, তাহলে তাঁরা যে কিসরা ও কায়সারের রাজত্বকে ছিন্নভিন্ন করার জন্যে, তাদের সিংহাসনকে টুকরো-টুকরো করার জন্যে অবিরাম সৈন্যদল প্রেরণ করেছেন, কেনো করেছেন? এসবের অর্থ কী? হযরত উসমান ও আলী রা. এবং পরবর্তী সময়ে উমাইয়া ও আব্বাসিয়া শাসকগণ যে ধারাবহিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিরাট বিরাট সেনাদল প্রেরণ করেছেন সেগুলোর অর্থ কী? হযরত উসমান রা.-এর খেলাফতের সময় আরমেনিয়া ও আজারবাইজানে এবং ককেশাস পর্বত থেকে ইউরোশিয়া পর্যন্ত যে সেনাদল প্রেরণ করা হয়েছে তাঁরা কীসের প্রতিরক্ষা করেছেন? কোন জিনিস রক্ষার জন্যে তাঁরা জিহাদ করেছেন? হিজরি পঁচিশ সাল থেকে নিয়ে তাঁরা রাশিয়াকে জয় করছিলেন না-কি নিজেদের প্রতিরক্ষা করছিলেন? তাঁরা কি তখন আরব উপদ্বীপের প্রতিরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন? হায় হায়! যাঁরা জিহাদ সম্পর্কে লিখেছেন তাঁরা যদি জিহাদের অর্থ বুঝতেন! জিহাদের স্বভাব-প্রকৃতি যদি তাঁদের বোধগম্য হতো! জিহাদের চরিত্র সম্পর্কে যদি তাঁদের জ্ঞান থাকতো!

অবশ্যই আমাদেরকে জিহাদের পাঠ এমনভাবে নিতে হবে যেনো আমরা আমাদের দীনের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে লজ্জাবোধ না করি। কুণ্ঠা যেনো আমাদের কণ্ঠরোধ না করে এবং ভীরুতা যেনো আমাদের দুর্বল করে না দেয়। আমরা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ওয়াদা করেছি—আমরা মানবিকতার কল্যাণে শহীদ হবো। আমাদের রব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্যদীনসহ প্রেরণ করেছেন সকল দীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।' [সুরা সাফ্ফ : আয়াত ৯]

আল্লাহপাক আমাদেরকে আদেশ দিয়ে বলেছেন—

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদেরকে বন্দি করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্যে ওত পেতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি তওবা করে, সালাত আদায় করে এবং

যাকাত দেয় তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [সুরা তওবা : আয়াত ৫]

সকল মানবের মুক্তির জন্যে এই দীনের আবির্ভাব ঘটেছে। তাহলে কীভাবে এই দীন প্রতিরক্ষামূলক হবে? তা কি মক্কার ভূমিকে প্রতিরক্ষা করবে না-কি মদিনার ভূমিকে প্রতিরক্ষা করবে না-কি আরব উপদ্বীপকে প্রতিরক্ষা করবে? যাঁরা আমার এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে চান তাঁদের উচিত হবে এই দীনের স্বভাব-প্রকৃতি বোঝা এবং আমাদের নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর 'পথ'কে জানা। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَداً. وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ. وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً. وَيَشُقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ.

'যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ সেই সত্তার শপথ, আল্লাহর পথে যে-পরিমাণ যখম হবে, কিয়ামতের দিন সেই পরিমাণ যখম নিয়ে উপস্থিত হবে; তার রং হবে রক্তের এবং ঘ্রাণ হবে মিসকের। যাঁর হাতে মুহম্মদের প্রাণ সেই সত্তার শপথ, আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারে আশঙ্কা না করতাম তাহলে আমি কখনো আল্লাহর পথে লড়াইকারী কোনো দলের পেছনে থেকে যেতাম না। কিন্তু সবার জন্যে সওয়ারি সরবরাহ করতে পারছি না। তাদের নিজেদেরও সওয়ারি সংগ্রহ করার সামর্থ্য নেই। আমার সঙ্গে জিহাদের অংশগ্রহণ না করা তাদেরকে পীড়া দেয়। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ সেই সত্তার শপথ, আমি খুবই আকাঙ্ক্ষা করি যে আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং নিহত হই। আবার লড়াই করি এবং নিহত হই। এবং আবার লড়াই করি এবং নিহত হই।'[২৬]

হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন—

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ والأَصْفَرَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيَ لأُمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وإِنَّ رَبِّيَ قَالَ:

---

[২৬] সহিহ মুসলিম : হাদিস ১৮৭৬; কানযুল উম্মাল : হাদিস ১০৬৪০; মুসনাদে আহমদ : হাদিস ৭১৫৭।

يا محمدُ إنّي إذا قَضَيْتُ قَضاءً فإنّهُ لا يُرَدّ، وإنّي أعْطَيْتُكَ لأمّتِكَ أنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامّةٍ أُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا من سِوَى أنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا

'নিশ্চয় আল্লাহপাক আমার জন্যে জমিনের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্ত বিস্তৃত করে দিয়েছেন। আমার জন্যে আল্লাহপাক যেই পর্যন্ত ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন সেই পর্যন্ত আমার উম্মতের রাজত্ব পৌছাবে। আমাকে দুটি ভাণ্ডার দেয়া হয়েছে; তার একটি লাল, অপরটি হলুদ। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছি যে তিনি যেনো আমার উম্মতকে মহামারী দিয়ে ধ্বংস না করেন এবং তাদের ওপর যেনো বহিঃশত্রু চাপিয়ে না দেন, ফলে তাদের শক্তি লুপ্ত হয়, যদিও তারা চারদিক দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'[২৭] তেমনি তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ

'যেখানে রাতের শেষ আছে এবং দিনের শুরু আছে সেখান পর্যন্ত এই দীন পৌছাবে। নগরে বা গ্রামে কোনো ঘর অবশিষ্ট থাকবে না যে-ঘরে আল্লাহপাক সম্মানিতকে সম্মান করার মাধ্যমে এবং হীনকে লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে এই দীন প্রবেশ করাবেন না। সেই সম্মানের দ্বারা দীনে-ইসলাম সম্মানিত হবে এবং লাঞ্ছনার দ্বারা কুফর লাঞ্ছিত হবে।'[২৮]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমরা রোমকে শাসন করবো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দুইটি শহরের কোনটি আগে বিজিত হবে; কন্‌স্টান্টিনোপ্‌ল না-কি রোম?' তিনি উত্তর করলেন, 'বরং হিরাক্লিয়াসের শহর (বাইজানটাইন) প্রথমে বিজিত হবে।' বাইজানটাইন ৮৫৭ হিজরিতে বিজিত হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে অবশ্যই একদিন রোম বিজিত হবে।

আমাদের দীন সেইসব শয়তানদের জন্যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করবে যারা পৃথিবীর সবকিছু নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিয়েছে। তারা মানুষের জন্যে কিছু অবশিষ্ট রাখে নি; আল্লাহর জন্যেও নয়। এই দীন এসেছে ইসলামি দাওয়াতকে সামনে রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে। এই ইসলামি দাওয়াত সকল মানবের জন্যে। শয়তানদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয় তারা আপনাকে দীন

---

[২৭] সহিহ মুসলিম : হাদিস ২০০৯; সুনানে তিরমিযি : হাদিস ২২০৪;

[২৮] মুসনাদে আহমাদ : হাদিস ১৬৯৫৭, ১৬৯৯৮; কানযুল উম্মাল : হাদিস ১৩৪৫

পৌছে দেয়ার জন্যে আহ্বান করবে। সুতরাং জিহাদ সেইসব রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করবে যেগুলো আল্লাহর এই দীনকে মানুষের কাছে পৌছাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর এই দীন সব মানুষের কাছে পেশ করা হবে। যার ইচ্ছা ঈমান গ্রহণ করবে আর যার ইচ্ছা কুফরি করবে। আর আমরা চাই, আমাদের তরবারি ধারণ করা এবং সিংহরূপে আবির্ভূত হওয়া ব্যতীত প্রত্যেক মানুষ যেনো এই দীন গ্রহণ করে। এটা ভ্রান্তিবিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভ্রান্তিবিলাসিতা তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা বাস করে আরামদায়ক অট্টালিকায় এবং বিভোর থাকে স্বপ্ন ও সুখনিদ্রায়।

জিহাদ ছাড়া অবস্থা আমাদের অনুকূলে আসবে না এবং জিহাদ ব্যতীত সূর্যের নিচে আমাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। সশস্ত্র লড়াই ছাড়া বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কোনো ওজন থাকবে না। তাদের অন্তরে আমাদের কোনো মূল্য থাকবে না। আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন—

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا

'সুতরাং আল্লাহর পথে লড়াই করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যে দায়ী করা হবে এবং তুমি মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করো। হয়তো আল্লাহ কাফেরদের শক্তি সংযত করবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। [সুরা নিসা : আয়াত ৮৪]

আল্লাহপাক তাঁর রাসুলকে লড়াইয়ে আদেশ দিয়েছেন এমনকি তিনি একা হলেও, এবং তিনি তাঁকে আরেকটি আদেশ দিয়েছেন তা হলো—আপনি কাফেরদের শক্তি প্রতিহত করার জন্যে মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করুন। সুতরাং কিতাল বা লড়াই হলো কাফেরদের শক্তি সংযত করার জন্যে এবং তাদের দাপটকে খর্ব করার জন্যে; এই লড়াই তাদের মানসিকতাকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে এবং তাদের প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার জন্যে, যাতে আমরা গোটা দুনিয়ার বুকে সকল মানুষের কাছে রাসুল-নির্দেশিত রহমত নির্বিঘ্নে পৌছে দিতে পারি।

জিহাদ ফরযে আইন

আরেকটি বিষয় হলো জিহাদ ফরয। মুসলমানরা যখন তাদের ঘরে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে তখন জিহাদ ফরযে কেফায়া। ফকিহগণ বলেন, ফরযে কেফায়ার সর্বনিম্ন স্তর হলো ইমাম প্রতিবছর একটি বা দুটি সেনাদল শত্রুদেশে প্রেরণ করবেন। তারা সেখানে অভিযান চালাবে এবং ফিরে আসবে। তারা তাদেরকে জিযিয়া দিতে বাধ্য করবে। তারা বলেন, বছরে অন্তত একবার ইমাম অভিযান প্রেরণ করবেন। যদি মুসলমানদের দেশ

থেকে কাফেরদের ভূমিতে বছরে একবারও অভিযান চালানো না হয় তালে ফরযে কেফায়া আদায় হবে না। কিন্তু নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোতে জিহাদ ফরযে আইন হিসেবে পরিগণিত হবে :

১. যখন মুসলমানদের ভূমি আক্রান্ত হবে;
২. যখন কাফেররা মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্যে সীমান্তে উপনীত হবে;
৩. ইমাম যখন অভিযানের জন্যে কোনো দল প্রেরণ করবেন- তাদের ওপর জিহাদ ফরযে আইন;
৫. যখন বৃহৎ দল আক্রান্ত হবে;
৬. পৃথিবীর পূর্ব বা পশ্চিম যেকোনো প্রান্তে যখন কোনো নারী বা মুসলমানের গৃহ আক্রান্ত হবে।

তাহলে বর্তমান সময়ে কোথায় জিহাদ ফরয নয়? দুনিয়ার কোন জায়গায় জিহাদ ফরয নয়? এখন কেবল ফিলিস্তিনে জিহাদ ফরয নয়, কেবল আফগানিস্তানে জিহাদ ফরয নয়; বরং আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে যেমন জিহাদ ফরয তেমনি যেখানে বা যে ভূখন্ডে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র হুকুম নেই সেখানেও জিহাদ ফরয। ফরযে আইনের হুকুম মুসলমানদের কাঁধে ততোদিন থাকবে যতোদিন না পৃথিবীর শেষ ভূখন্ডটিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র শাসন চালু হয়। ফরযে আইনের হুকুম আমাদের ওপর অব্যাহত থাকবে যতো দিন না আমরা বুখারা, তাশকন্দ, সমরকন্দ, আন্দালুসিয়া (মুসলিম স্পেন), ককেশাস, সাইবেরিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, হাঙ্গেরি, আলবেনিয়া, রোমানিয়া এবং এরকম আরো যেসকল রাষ্ট্রে কোনো একদিন এই দীনের ছায়া ছিলো এবং মহানবীর শরীয়তের শাসন ছিলো সেসকল রাষ্ট্র আমাদের অধিকারে ফিরিয়ে না আনতে পারি।

সুতরাং ফরযিয়্যতে আইন (চূড়ান্ত আবশ্যকতা) এখন কোনো ভূখণ্ড বা কোনো সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। কোনো একটি জাতির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। শুধু আফগানিস্তান আর ফিলিস্তিনে জিহাদের ফরযিয়্যত সীমাবদ্ধ নয়। যদিও এই দুটি স্থানে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিটি মুসলমানের কাঁধে বালেগ হওয়ার পর থেকে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত ফরযিয়্যতে আইন আবশ্যকভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আমরা বলতে চাই, ইসলামি দেশগুলো ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত জিহাদের ফরযিয়্যতে আইন অব্যাহত থাকবে। ফরযিয়্যতে আইনের ব্যাপারটির সমাধান কেবল কাগজ-কলমের দ্বারা হবে না; অধিকার আদায়ের দাবি-দাওয়া করেও কাজ হবে না। কেননা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং আমরা কোনো প্রাপ্য পাই নি। কবি যথার্থই বলেছেন—

لنطلبن بحد السيف مطلبنا   فلن يخيب لنا في جنبه إرب

أجاب كل سؤال عن هل بلم   من إقتضى بسوى الهندى حاجته

'আমরা আমাদের দাবি তরবারির ধার দিয়ে আদায় করবো, তাহলে সে-ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধি প্রতারণা করবে না। কেউ যদি তার অধিকার দাবি করে তরবারি ছাড়া তাহলে তার প্রতিটি চাওয়ার জবাব দেয়া হয় 'কিছুতেই না' দিয়ে।' কবিতার মূলকথা হলো তরবারিই কেবল অধিকার আদায় করতে পারে।

সা'দ জুমআ তাঁর গ্রন্থ المؤامرة ومعركة المصير (ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই)-এ লেখেন, আমি ১৯৬৭ সালের পর ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলাম, আমরাই ফিলিস্তিনের প্রকৃত অধিকারী। জবাবে তিনি বললেন, ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে সত্য বলে কিছু নেই। তাদের রাজনীতিতে সংস্কার জরুরি। সত্য প্রতিষ্ঠা নয়; বরং তারা দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তারা যে রাজনীতি করছে সেই রাজনীতি করার অধিকার তাদের নেই। ব্যস, এ পর্যন্তই। তারা বলেই যাচ্ছে, তোমাদের রাজনীতিতে সত্য বলে কিছু নেই, রাজনীতি করার অধিকার তোমাদের নেই। তাহলে কীভাবে আপনারা অধিকার দাবি করতে পারেন? আর জাতিসঙ্ঘ আপনাদেরকে কোনো দিন কোনো অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে কি? আর শক্তি প্রদর্শন ছাড়া কবে আমাদের শত্রুরা আমাদের দিকে তাকিয়েছে? তাকান, ভালো করে চারপাশে তাকান! আফগানিস্তান এবং অন্য যেকোনো ইসলামি ভূখণ্ডের মাঝে তুলনা করে দেখুন। মুসলিম জাতি সেখানে তরবারি হাতে নিয়েছে। শত্রু নেতাদের জাহান্নামে পাঠাচ্ছে। কণ্ঠনালী জবাইয়ের জন্যে প্রস্তুত করছে এবং শত্রুদের প্রতিহত করছে। শহীদের মিছিল চলতে শুরু করেছে এবং রক্তের সাগরে জিহাদের জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। সেই জাতির গান হচ্ছে—

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

'আর তাদের কথা এই ছিলো যে, তারা বললো, হে আমাদের রব, আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে বাড়াবাড়িকে ক্ষমা করুন। আমাদের পদক্ষেপ সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দান করুন।' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৭]

প্রত্যাশার যন্ত্রণা

মানুষ মনে করে আফগানিস্তান সহজেই এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অথচ আফগানিস্তানে এমন কোনো ঘর নেই যেখানে এতিমের কান্না নেই, বিধবার বিলাপ নেই, সন্তানহারার হাহাকার নেই। আমি আমাদের এক ভাইয়ের

জন্যে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আমার স্ত্রীকে এক আফগান বোনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তার বড়ো বোন আমার স্ত্রীকে বললেন, হে উম্মে মুহাম্মদ, আপনি কি মনে করেন আমাদের ভেতর বংশধর সৃষ্টির বাসনা বা কামাকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট আছে? আল্লাহর কসম, আমি বিয়ে করেছিলাম এই ভেবে যে, যাওয়া-আসার পথে যেনো আমার একজন পুরুষ থাকে, মাহরাম থাকে। অথচ বিয়ের পর দুইমাস চলে গেলো আমিও তাকে দেখি নি, সেও আমাকে দেখে নি।

মানুষ সেখানে পেরেক ও কাঁটায় আকীর্ণ পথে হেঁটেছে। দাউদাউ আগুনে গড়াগড়ি খেয়েছে এবং জ্বলন্ত কয়লায় বসবাস করেছে। চলমান পেষণযন্ত্র মানুষকে; তাদের হাড় ও পাঁজরকে, স্নায়ু-শিরা-আত্মাকে পিষেছে। এমন আফগান কমান্ডারও আপনি পাবেন যিনি রাশিয়ার পায়ের নিচের মাটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। রুশ বাহিনী শুধু তার নাম শুনেই ভয়ে কেঁপে উঠেছে। অথচ কোনো আকস্মিক ঘটনায় তার মগজ বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। ওষুধ কেনার পয়সা নেই, খাবার কেনার পয়সা নেই। কিছু কেনার পয়সা নেই।

হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছি, ওষুধের পয়সা নেই, খাবারের পয়সা নেই। তাদের প্রত্যেকে চারপাশে তাকাচ্ছে, বাবাকে খুঁজছে আর বাবা মাটির নিচে চাপা পড়েছে। মাকে খুঁজছে আর মায়ের ওপর ঘর ধসে পড়েছে। বড়ো ভাইকে খুঁজছে, আর সে অনেক আগে থেকেই বন্দি আছে। তারা জানে না তাদের গন্তব্য কী।

তারা তাদের সন্তানদের খুঁজছে; তাদের কেউ হয়তো গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কেউ হয়তো মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ হয়তো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে। কেননা ছোটোবেলা থেকেই প্রতিদিনই সে দেখে আসছে তাদের বাড়িঘরে গোলা আঘাত হেনেছে, ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। সুতরাং তার মানসিক বিকৃতি ঘটা বা বিকৃতমস্তিষ্ক হওয়াই স্বাভাবিক। কেউ কেউ বা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছে। আপনারা কী বলবেন? আপনারা তাদের ব্যাপারে কী চিন্তা করেন?

বর্তমান সময়ে পাকিস্তানের পেশোয়ারে পঁয়ত্রিশ লাখ মুহাজির রয়েছেন। ইরানে পনেরো লাখ মুহাজির রয়েছেন। (লোকে তাদের বলে আফগান শরণার্থী।) এবং আফগানিস্তানের ভেতরে বাস্তুচ্যুত হয়ে—চার লাখ দুই হাজার চারশো চব্বিশ বর্গমাইলের আফগানিস্তানের এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায়—দুই কোটি আফগান নাগরিকের ভেতর হিজরত করেছেন সত্তর লাখ বা এক কোটি বিশ লাখ নাগরিক। (২০১০ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী আফগান লোকসংখ্যা দুই কোটি বিরাশি লাখ।) এই হিজরত হয়তো চলতেই থাকবে। তারপরও... আলহামদুলিল্লাহ।

এক আফগান কমান্ডার—নাম তাঁর আগা ওয়ালিদ, তাখার ও উত্তরাঞ্চলের ইশকামাশ এলাকায় বড়ো কমান্ডার ছিলেন—আমাকে বলেছেন, 'একদিন আমাদের বাড়িতে বিমান হামলা হয় এবং বাইশজন নিহত হয়। আমার স্ত্রীসহ আমার সকল আত্মীয়-স্বজন একমুহূর্তের ভেতর মাটিতে মিশে যায়।' এই খবর নতুন কিছু নয়; এইসব ঘটনা আফগানিস্তানে স্বাভাবিক ব্যাপার। তারপরও তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

আরেকদিন এক আফগান আমাকে তাদের গল্প বলছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'একবার আমাদের কাছে খবর আসে যে আমার আত্মীয়-স্বজনের বিশজন বা বাইশজন শাহাদাত বরণ করেছেন।' এই কথা বলেই তিনি থেমে গেলেন এবং জিহাদের আরেক গল্প শুরু করলেন। এইসব গল্প তাকে বিচলিত করছিলো না, তাকে উদ্বিগ্ন করছিলো না। যেনো তিনি হামযা রা., মুয়াবিয়া রা. বা বাদশা হারুনুর রশিদের সময়কার বা অন্য কোনো সময়ের গল্প বলছেন।

তারা এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর ভয়ে তারা পিছু হটছে না এবং মৃত্যু তাদের অন্তরে কোনো ভয় সৃষ্টি করতে পারছে না। আপনি যদি আফগানিস্তানে যান এবং হাঁটেন, দেখবেন পুরো আফগানিস্তানের মাটি পুড়ে তামা হয়ে গেছে। ক্ষেপণাস্ত্রের কাঠামো, বোমার স্প্রিন্টার ও গোলার খোসায় আফগানিস্তানের মাটি পরিপূর্ণ। অন্তত পাঁচবার ক্ষেপণাস্ত্র আর বোমা আর গোলায় আফগানিস্তানের মাটি ঢেকে দেয়া হয়েছে। টনকে টন গোলা সেখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমি অনেক জায়গা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আগুনের লাভা বের হতে দেখেছি। অন্যান্য গোলার চেয়ে ক্ষেপণাস্ত্র বেশি ধ্বংসাত্মক, ভূত্বকের জন্যে অধিক ক্ষতিকারক। রুশ বাহিনী দেখলো গোলা আঘাত হানছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোর শক্তি মাটির ভেতরেই নিঃশেষ হচ্ছে। তখন তারা আরেকটি কাজ করলো। প্যারাশ্যুটে বেঁধে গোলা ফেলতে লাগলো, যাতে সেগুলো মটির ভেতরে ঢুকে না যায় এবং সব শক্তি ভূপৃষ্ঠ-ধ্বংসে কাজে লাগে।

আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকতাম, বোমারু বিমান আসতো এবং ছোটোছোটো মাইন ফেলতো। সেগুলো ঘাসফড়িংয়ের মতো সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে থাকতো। সামান্য শব্দের আঘাতেই সেগুলো বিস্ফোরিত হতো। সেগুলোর ওপর পাড়া দেয়ার দরকার নেই আপনার। আপনি সেগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই বিস্ফোরিত হবে এবং আপনাকে উড়িয়ে দেবে।

জালালাবাদের পতন ঘটে নি কেনো

এই জালালাবাদ, লোকেরা বলে, হায়, জালালাবাদের তো পতন ঘটে নি! প্রথমত, জালালাবাদ শিয়াদের উৎসভূমি। দ্বিতীয়ত, জালালাবাদ এমন শহর, যাতে এক লাখ শিয়া রয়েছে। তৃতীয়ত, জালালাবাদে রয়েছে বিমান বন্দর। চতুর্থত, তারা মরণপণ লড়াই করে। কেননা তারাও আফগান। আফগানরা সবসময় কঠোর হয়ে থাকে। বিশেষ করে শিয়ারা অধিক কঠোর। এক মুজাহিদ আমাকে গল্প বলেছেন। তিনি বলেন, "আমরা একটি শিয়াকে পাকড়াও করলাম এবং তার মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিলাম। আমরা তাকে বললাম, 'তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো।' সে বললো, 'সম্ভব নয়। বিশ বছর ধরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি, এর এখন আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবো?' আমরা তার গলায় রশি লাগালাম এবং তাকে বললাম, বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সে বললো, 'না, সম্ভব না।' আমরা তার গলায় রশি শক্ত করে এঁটে দিলাম। তার চোখ ঘোলাটে হয়ে এলো এবং তার নাক থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। তারপর আমরা রশি ঢিল করলাম এবং তাকে বললাম, বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। সে বললো, 'না, সম্ভব না।' অবশেষে আমরা রশি শক্ত করে কষে ধরলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে সে মারা গেলো এবং জাহান্নামে পৌছালো। তা কতোই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল।"

এখন সরকার মুজাহিদদের ওপর টনকে টন গোলা নিক্ষেপ করছে। সাড়ে পাঁচ টন ওজনের গোলাও রয়েছে। এসব গোলা এক বর্গমাইলব্যাপী সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। আপনারা কেউ ভাববেন না আফগানিস্তানে জিহাদ ও লড়াইয়ের বিষয়টি খুব সহজ। শত শত মানুষ সেখানে ধূলির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। তাই আরবদের আগমন তাদের জন্যে ছিলো রহমত। আরবরা তাদের মনোবল চাঙ্গা করেছে। তাদেরকে উজ্জীবিত করেছে। আফগানরা তাদের ভাইদেরকে তাদের পাশে পেয়েছে। ফলে তাদের চেতনা নতুনভাবে শাণিত হয়েছে এবং তাদের সংকল্প সুদৃঢ় হয়েছে। তারাও পুরুষ। তাদেরও পৌরুষ আছে। আত্মসম্মানবোধ আছে। তাদেরও বীরত্ব আছে। তারা যখন আরবদের দেখলো তারা সামনে এগিয়ে গেলো। যদিও মৃত্যু ছিলো তাদের প্রতীক্ষায়। তারা আরবদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো। যদিও তারা ছিলো ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অধিক আত্মত্যাগের লক্ষ্যে তারা আরবদেরকে ছাড়িয়ে গেলো। মানুষ তো রক্ত-মাংস ছাড়া কিছু নয়। মাংস-হাড়-শিরা।

হেরাতে একদিনে চব্বিশ হাজারও নিহত হয়েছে। বাক্যটি আরো একবার পড়ুন—একদিনে চব্বিশ হাজারও নিহত হয়েছে। কাবুলে মুজাহিদরা রুশ ও শিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে। তারা শিয়াদেরকে পরাস্ত করেছে। শিয়ারা অন্যভাবে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে। তারা মুজাহিদদের পরিবারকে

ধ্বংস করেছে, তাদের সন্তানদের ধ্বংস করেছে। লোকেরা মসজিদে সমবেত হয়েছে। দুর্বল নারীরা ও শিশুরা মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে। শিয়ারা যখন জিহাদের ময়দানে পরাস্ত হয়েছে, তারা মসজিদে বিমান হামলা করেছে। নারী ও শিশুদের ওপর গোলা বর্ষণ করেছে। তাদেরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। মসজিদে কেউ আর জীবিত থাকে নি। তবে এক মায়ের কোলে একটি শিশুটি রক্ষা পায়। সেই মা ছিলো মৃত। গোলার আঘাতে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিলো। তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তার মগজের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে শিশুটির মুখের ওপর পড়ে। ফলে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে যায়। সৌদি আরবের এক যুবক আদেল তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন, "সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আমি ও কমান্ডার (তিনি ছিলেন কঠিন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন) মসজিদে এলাম। আমি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। কমান্ডার আমাকে বললেন, তুমি কাঁদছো কেনো? দেখুন আফগান কমান্ডার আরব যুবককে বলছে, তুমি কাঁদছো কেনো? আমি বললাম, আমি কাঁদবো না? এরা কি আপনার পরিবার-পরিজন, আপনার আত্মীয়-স্বজন নয়? তিনি আমাকে বললেন, তাতো অবশ্যই। তবে যুদ্ধ এক দীর্ঘ-ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া। যুদ্ধ দাবি করে আগুন ও রক্ত। এবং আমরা এই পথেই হাঁটবো। আর আমি এবং তুমি, দুইজনের জীবনই এই পথে শেষ হতে পারে। এখানে আরেকটি বিষয় আছে যা আমাদেরকে আরো বেশি আঘাত দেয়। তুমি কি জানো তা কী? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এই বিনাশসাধনের পাশাপাশি আমাদের জাতিরই একটি দল আমাদেরকে মুশরিক আখ্যা দেয়। এইসব দৃশ্য দেখার চেয়ে তাদের এই অপবাদ আমাদের আরো বেশি আঘাত করে, আরো বেশি পীড়া দেয়।"

সাদাকাতুল ফিতর জিহাদে দেয়ার বিধান

হে বন্ধুরা, ভালো করে শুনুন। আবদুল্লাহ ইবনে বায ফতোয় দিয়েছেন, সাদাকাতুল ফিতর আফগানিস্তানে পাঠানো জায়েয হবে। রাবেতা আল আলম আল ইসলামি রিয়াদে তিন মিলিয়ন রিয়াল সংগ্রহ করেছে। তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছেন, সব রিয়াল খরচ করে ফেলুন। একদিনের বেশি যেনো তা অবশিষ্ট না থাকে। তিন মিলিয়ন রিয়াল দিয়ে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করুন এবং দ্রুত বণ্টন করে দিন। যারা আফগানিস্তান থেকে ইরানে হিজরত করেছে তারা এখন তীব্র সঙ্কটে আছে। তাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

তাদের কাছে কোনো জনকল্যাণমূলক সংস্থা যায় নি; আরব থেকেও যায় নি, আরবের বাইরে থেকেও আসে নি। না কোনো মুসলমান সংস্থা, না কোনো খ্রিস্টান সংস্থা, কোনো ধরনের সংস্থাই ইরানে প্রবেশ করে নি এবং একটি

খাদ্যশস্যও তাদের দিকে বাড়িয়ে দেয় নি। কোনো কোনো সংস্থার ইরানে প্রবেশের বিষয়টি হয়তো নিষিদ্ধ ছিলো। ইরানের সরকারও হয়তো মুহাজিরদেরকে তেমনকিছু দেয় নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমার বন্ধুরা ঈদুল ফিতরের রাতে খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করেন এবং ইরানে আশ্রিত আফগান মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দেন। এক কিলোগ্রাম, দেড় কিলোগ্রাম, দুই কিলোগ্রাম—এইভাবে তাঁরা মুহাজিরদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বন্টন করেন। আমার ভাইয়েরা আমাকেও সামান্য দায়িত্ব দেন। আমরা দুই কিলোগ্রাম খাদ্যসামগ্রী নিয়ে একেকটি পরিবারের কাছে যেতাম আর তারা ঈদুল ফিতরের রাতে এই খাদ্যসামগ্রী পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলতো। দীর্ঘ দিন তারা অনাহারে থেকেছে, দীর্ঘ সময় তারা কোনো খাবার দেখে নি। আমরা শিশুদেরকে এতিমখানায় নিয়ে আসতাম। তারা এতিমখানায় একমাস-দুইমাস থাকলেও ভাত খেতে জানতো না। তারা জানতো না কীভাবে ভাত খেতে হয়। তারা জীবনে কখনো ভাত দেখে নি।

হেরাতে, আফগানিস্তান-ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় অনেক উদ্বাস্তু ছিলো। তারা দীর্ঘদিন ঘাস খেয়ে বেঁচেছে। দীর্ঘদিন ঘাস খাওয়ার ফলে তাদের ঠোঁট ছাগলের ঠোঁটের মতো খসখসে-কালো-শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সবুজ রং তাদের চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিলো এবং তাদের ঘামে দেখা যাচ্ছিলো ঘাসের রং। তাদের দলপতি তাদের কাছে এলো এবং তাদেরকে বললো, 'তোমরা যদি এই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে। এখানে তো কোনো পানি পাওয়া যায় না। তোমরা যদি কোনো ঝরনার পাশে চলে যেতে এবং সেখানে বসবাস করতে।' লোকেরা বললো, 'ঝরনার পাশে ঘাস কোথায় পাবো? ঝরনার পাশে তো ঘাস নেই। ঘাস খেয়েই তো আমরা বাঁচি।'

তারা টক ও জমাটবাধা দুধ খেতো। রুটি তাদের জুটতো না, ভাত তাদের জুটতো না, কোনোকিছুই তাদের জন্যে জুটতো না। ফলে তারা পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হয়। তাদের পাকস্থলীতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তারা অস্থির হয়ে খাবার খুঁজে বেড়াতো। পুরোনো খাবার, গত বছরের পুরোনো খাবার। টক দুধ ছাড়া তারা কিছুই পেতো না। টক দুধ খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতো। ফলে তাদের পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়। হায়, তারা সামন্য রুটিও পেতো না, সামান্য ভাতও পেতো না। অবশেষে তারা পাকস্থলীর চিকিৎসা নিতে আসতো। আল্লাহপাক হয়তো তাদেরকে লক্ষ্য করেই বলেছেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

'তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহপাক জানবেন না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর তোমাদের মধ্যে কে ধৈর্যশীল?' [সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪২]

জিহাদের ময়দানে থেকে ইসলামকে বোঝা

মানবজাতি জানের জিহাদ করা ছাড়া ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবে না। আমি মালের জিহাদের কথা বলছি না; আমি বলছি জানের জিহাদের কথা। আমি বলছি 'জিহাদ বিন নাফস'-এর কথা। দৃশ্যটি কল্পনা করুন, আমাদের সামনে একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টির উচ্চতা চার হাজার মিটার। কোনো আফগানকে বলা হলো, সে যেনো তার গাধার ওপর তার অস্ত্র-আসবাব-খাদ্য বোঝাই করে এবং গাধাটিকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে। তারপর গাধাটিকে নিয়ে নিচে নেমে আসে। দেখা যাবে, গাধাটি পথেই মারা গেছে এবং তার মালিকেরও প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমনও দেখা গেছে, হয়তো কেউ খচ্চর নিয়ে পাহাড়ে উঠতে গেছে, খচ্চরটি পাহাড়ে ওঠার পথেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং রাস্তার কিনারায় এসে উপত্যকায় উল্টে পড়েছে। ফলে খচ্চর ও খচ্চরের আরোহী মারা পড়েছে।

পাহাড়ে ওঠার এক মাইলের ভেতরে হয়তো ৭৫টি খাঁজ বা সিঁড়ি কাটা আছে। সিঁড়িগুলো বরফে ঢাকা। আপানকে বলা হলো, আপনি এখন পাহাড়ে উঠবেন। আপনার পাশে একজন আফগানও আছে। তার সামনে আছে তার গাধাটি। সে তার গাধাটিকে উপরের দিকে ঠেলে তোলার চেষ্টা করছে। নামার সময়ও হয়তো সে তার গাধাটির সহায়তা নেবে। কিন্তু হঠাৎ গাধাটির পা পিছলে গেলো এবং সেটি উপত্যকায় পতিত হয়ে মারা পড়লো। সঙ্গে তার আরোহীও মারা পড়লো। আপনি ভাবুন যে আপনি ওপরের দিকে আরোহণ করছেন। আর ওপর থেকে অনেকগুলো ঘোড়া বা গাধা মালামাল নিয়ে নামছে। হঠাৎ কোনো ঘোড়ার বা গাধার পা পিছলে গেলো এবং আপনার ওপর এসে পড়লো। ঘোড়াটি বা গাধাটি হয়তো তার মাথায় আপনাকে সেঁধিয়ে নিয়ে নিচে পতিত হবে এবং আপনি আপনার জীবনের চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হবেন। আপনি বিষয়টিকে হালকা ভাববেন না এবং এটিকে সহজ মনে করার উপায় নেই। আপনি মনে করবেন না তাদের এই বিজয় এতো সহজেই সূচিত হয়েছে। আল্লাহপাক বলেছেন—

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'তোমরা কি মনে করো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিদর্শন আসার পূর্বেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? তাদেরকে গ্রস্ত করেছিলো দুর্দশা ও কষ্ট এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিলো। অবশেষে রাসুল এবং তাঁর

সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিলো তারা বলেছিলো, আল্লাহর সাহায্য আসবে কখন?' [সুরা বাকারা : আয়াত ২১৪]

চিন্তা করুন কী ভয়াবহ দুর্দশায় তাঁরা পতিত হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত রাসুলও আর্তস্বরে বললেন, আল্লাহর সাহায্য আসবে কখন?

ফজরের আযানের পর আমরা নামায পড়তাম। তারপর আমরা ঘোড়ায় আরোহণ করতাম। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে ঘোড়ায় আরোহণ করে কোথাও যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা ঘোড়ায় চড়ে কিছুদূর যেতাম এবং নেমে পড়তাম। কিন্তু আরোহণ না করে কোনো উপায় থাকতো না। চারদিকে বরফের আস্তর পড়ে আছে। আপনি যেখানেই পা রাখবেন আপনার পা পিছলে যাবে। আমরা এক খণ্ড মাটি, কোনো পাথর পা পাথুরে জমিন অথবা মৃত গাধা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতাম, যাতে আমরা সেটার ওপর কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়াতে পারি। আমরা দুই হাত ও দুই পা—চারপায়ে হাঁটতাম। অর্থাৎ আমরা হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোতাম। সেখানে মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে হাঁটা সম্ভব ছিলো না। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার যখন আরো একশো মিটার বাকি থাকতো, আমরা ক্লান্তিতে এতোটাই অবসন্ন হয়ে যেতাম যে নিজেদেরকে আর উঁচু করতে পারতাম না। এখনো আমার বিস্ময় জাগে, কীভাবে তখন আমার পক্ষে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা সম্ভব হয়েছিলো! এভাবে ক্লান্ত হয়ে যখন কোনো গাধা পতিত হওয়ার উপক্রম করতো, তার আরোহী তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতো। সে সেটির পেছনে পেছনে কিছুদূর যেতো তারপর হতাশ হয়ে পড়তো। তারপর সে তার গাধাটিকে মৃত্যুর পথেই ছেড়ে দিতো।

এইসব কষ্টে কখনো কখনো আমি অট্টহাসি হাসতাম। ভয়াবহ বিপদ কি মানুষকে অট্টহাসি হাসায়? মনে করুন, আমার সঙ্গে আপনি সফরে আছেন। আপনার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথে রয়েছে সাতটি পাহাড়। আপনি সেখানে আসমান ও জমিনের মাঝখানে ঝুলে আছেন।

ফজরের নামাযের সময় নামায পড়তে চাইতাম। তেমনিভাবে যোহরের ও আসরের নামায পড়তে চাইতাম। কিন্তু কোথায় পড়বো নামায? সে-সময়ে তো আমরা পাহাড়ের নিচে নামতে পারি না। মাগরিবের আযানের পর অবশ্য নামা যায়। সেই ফজর থেকে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত একটানা পহাড়ের ওপর দিয়ে পথচলা। যুবকেরা পাহাড়ের ওপর ক্লান্তির তীব্রতায় মৃত্যু কামনা করতো। কখনো কখনো ক্লান্তি মানুষকে পেয়ে বসে।

পাহাড়ের ওপরে থাকতো বরফের স্তূপীকৃত স্তর। জ্যাকেট বা শীতের পোশাক থাকতো অল্প। বুক-পিঠ জ্যাকেট দিয়ে শুধু শরীরের মধ্যাংশ ঢাকা যেতো। সে-জ্যাকেটও বহন করা যেতো না। আমি তা খুলে গাধা বা ঘোড়ার

পিঠে রেখে দিতাম। একবার একটি ঘটনা ঘটলো। পাহাড়ের শিখরে ওঠার আগে আমার কাছে এক আফগান এগিয়ে এলো। সে বললো, ঘোড়া তো মরে গেছে। তারপর সে ঘোড়ার পিঠের সব আসবাব নিজের কাঁধে তুলে নিলো এবং এগিয়ে চললো।
পথে এক যুবকের দেখা পেলাম। তার বাড়ি ইরাক এবং নাম আলি। সে আমাকে বললো, 'তারা কি আমাকে এখানে এই জন্যে ফেলে রেখে গিয়েছে যে আমি এখানে মারা যাই?' আসলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এখানে কারো পক্ষে করার কিছু নেই। আপনি তার গাঁটরি বহন করতে পারবেন না। এমনকি তার কোনো কলমও আপনার পক্ষে বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা তাকে ফেলে গিয়েছে যাতে সে বরফের মাঝে মৃত্যুবরণ করে। তার কাছে স্লিপিং ব্যাগ ছিলো। সঙ্গীরা তাকে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর ভরে শুইয়ে রেখে গিয়েছিলো। সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো এবং মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। রাতে সে ছিলো একা। তারা তাকে পাহাড়ের চূড়ায় রেখে গিয়েছিলো যাতে সে সেখানে মারা যায়। তাদের কেউ তাকে কোনো সহায়তা করতে পারে নি। তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি তাদের ছিলো না। তারা জানিয়েছিলো, তুমি ধৈর্য ধরো, তোমার সঙ্গে আল্লাহপাক আছেন। সে সেখানে তিনদিন সেভাবে পড়ে ছিলো। অবশেষে একটি দল তার কাছে এলো এবং তাকে বহন করে নিয়ে গেলো। তারা তাকে হাসপাতালে পাঠালো। তার দুই পা অবশ হয়ে গিয়েছিলো। ফলে তার দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো কেটে ফেলতে হলো।
কতো মানুষ এভাবে বরফের কবলে পড়ে ঠাণ্ডায় মৃত্যুবরণ করেছে। এরা সব আরব যুবক। আমরা আশা করি আল্লাহপাক তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।
যিনি (কাতারের রাজধানী) দোহার মতো শহরে বাস করেন, যেখানে আছে স্নিগ্ধ ছায়া, কোমল পানীয়, সুপেয় পানি, আছে পর্যাপ্ত ফল ও মিষ্টান্ন, আছে রুটি এবং হরেক রকমের গোশত ও কাবাব, রসনাবিলাসের সব উপকরণ আছে, আছে আরাম-আয়েশের সব উপকরণ—তাঁর মনে হয়তো ইসলামের খেদমত করার আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে। তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে কোনো মজলিসে অংশগ্রহণ করবেন বা কোনো উপস্থিত মজলিসে বক্তৃতা দেবেন। তারপর দ্রুত তাঁর সুবাসিত স্নিগ্ধ আবাসে ফিরে আসবেন। এভাবেই তিনি ইসলামের খেদমত করার চেষ্ট করবেন।
আর যারা আসলেই ইসলামের খেদমত করতে চায় নিজেদের জান দিয়ে, শরীরের রক্তবিন্দুকে জলে পরিণত করে, যারা ইসলামকে অধিষ্ঠিত করতে চায় চূড়ান্ত মর্যাদার আসনে, তাদের অবস্থা দেখুন। তারা সকালে পানশির

থেকে তাখারের অভিমুখে রওয়ানা হয়। সারাদিন পথ হেঁটে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পর শুরু হয় শৈত্যপ্রবাহ। মাগরিবের নামায পড়ে তারা আবার চলতে শুরু করে। শৈত্যপ্রবাহের ভেতর দিয়ে তারা চলতে থাকে। বরফ পড়তে শুরু করে। বরফের স্তূপ মাড়িয়ে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। বরফের ছোটো ছোটো টুকরো তাদের জুতার ভেতর ঢুকে পড়ে। তারা হয়তো তা টের পায় না। তারা চলতে থাকে এবং তাদের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। অবশেষে তারা আঞ্জুমানে পৌঁছায়। তারা তাদের মোজা খুলতে চায়। কিন্তু বিধিবাম! তাদের পা ফুলে গেছে এবং মোজা পায়ের সঙ্গে আটকে গেছে। ব্যথা শুরু হয়। তারা যতোই মোজা খোলার চেষ্টা করে ব্যথা ততোই বাড়ে। তারা চিৎকার শুরু করে। আশপাশের গ্রামের লোকজন এসে তাদের পাশে জড়ো হয়। তারা দেখতে পায় আগন্তুকদের পায়ের আঙ্গুলগুলো বরফের ছাঁচে পরিণত হয়েছে এবং কোনো কোনো আঙ্গুল ভেঙ্গে গেছে।

জিহাদের বিষয়টা আসলেই কঠিন বিষয়। জিহাদ ছাড়া সব ইবাদতই ঘরে থেকে স্ত্রী-কন্যা-পুত্রদের মাঝে বাস করে পালন করা আপনার পক্ষে সম্ভব। আপনি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে নামায আদায় করছেন। আপনি রোযা রাখছেন, আপনার চারপাশে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আছে। আপনি হজের সফরে গেলেন, ফোনে আপনার পরিবারের সবার খোঁজখবর রাখলেন। মনে হবে, কতো সুখেই না আছেন আপনি! আর জিহাদ! আপনি সেখানে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আপনার পুত্রকন্যাদের নিয়ে যেতে পারবেন না। এয়ারকন্ডিশনারও নিয়ে যেতে পারবেন না। মার্সিডিস-পাজেরো গাড়ি নিয়েও জিহাদে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি পাহাড়ের ওপর আপনার মার্সিডিস-পাজেরো চালাতে পারবেন না। নুরসাতান বা হিন্দুকুশ পর্বতের ওপর আপনার পাজেরো-মার্সিডিস চলবে না। সেখানে আপনার পা-ই আপনার গাড়ি। পাহাড়ের খাঁজই আপনার মার্সিডিস।

একারণেই জিহাদ মানুষকে পার্থিব জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখে। আপনি আপনার কোম্পানিতে থেকে রোযা আদায় করতে পারবেন। আপনি আপনার অফিসে থেকে নামায আদায় করতে পারবেন। আপনি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যাকাত আদায় করতে পারবেন। কিন্তু আপনি এগুলোর কোনো একটিতে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এ-কারণেই আল্লাহপাক বলেছেন—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বলো, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসাবাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা তোমরা করো এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালোবাসো, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহপাক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' [সুরা তওবা : আয়াত ২৪]

যদি সমস্ত দুনিয়া একহাতে থাকে তাহলে অপর হাতে থাকবে জিহাদ। কারণ এই দুটিকে একত্র করা সম্ভব নয়।

পানশিরে যুদ্ধবিরতি

আহমদ শাহ মাসউদ[২৯]। আপনারা এই নেতার নাম শুনেছেন। আপনারা

---

[২৯] আহমদ শাহ মাসউদ ১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারি পানশিরের জানকালাক এলাকার বাজারাক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দোস্ত মুহাম্মদ খান আফগান রয়্যাল আর্মিতে কর্নেল ছিলেন। আহমদ শাহ কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পশতু ছাড়াও ফরাসি, ফার্সি, উর্দু ভালো বলতে পারতেন এবং ইংরেজি ভালো পড়তে পারতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাককালীন জমিয়তে ইসলামির ছাত্র সংগঠন সয়মান-ই জোওয়ানান-ই মুসলমান (Organization of Muslim Youth)-এ যুক্ত হন। তখন জমিয়তে ইসলামির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক বুরহান উদ্দিন রব্বানি। ১৯৭৫ সালের দিকে জমিয়তে ইসলামি ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন হিযবে ইসলামির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এ-সময় হিযবে ইসলামির কর্মীরা আহমদ শাহকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৯৭৮ সালের ২৭ এপ্রিল পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব আফগানিস্তান (মার্ক্সবাদী) এবং সেনাবাহিনীর একটি দল প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। তারা সমাজতন্ত্রের বিস্তার এবং সেভাবে নীতি নির্ধারণ করতে চাইলে দেশের ইসলামি দলগুলোর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ-সময় সমাজতন্ত্রী সেনাদের হাতে সারাদেশে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ মানুষ নিহত হয়। ১৯৭৯ সালে ২৪টি প্রদেশে সংঘাত শুরু হয়। অর্ধেকের বেশি সৈনিক সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে যায়। ৬ই জুলাই আহমদ শাহ মাসউদ পানশিরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সম্মুখ যুদ্ধে সফল না হয়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। এ-বছরেই ২৪ শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগান সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সেনা প্রেরণ করে। সরকারবিরোধীদের তারা নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। আহমদ শাহ সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রুশ বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করে। তারপরও পিপলস্ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সরকার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। আহমদ শাহ মাসউদ সরকারবিরোধী লড়াই অব্যাহত রাখেন। দেশে চরম দুরবস্থা বিরাজমান রেখে ১৯৯২ সালে ১৭ই এপ্রিল এ-সরকার ক্ষমতা ত্যাগ করে। ২৪ শে এপ্রিল পেশোয়ারে সমাজতন্ত্রবিরোধী দলগুলোর মধ্যে শান্তি ও ক্ষমতাবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ-চুক্তিতে আহমদ শাহ মাসউদকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। কিন্তু হেকমতিয়ার এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। পরে অবশ্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৭ শে সেপ্টেম্বর তালেবান ক্ষমতা দখল করে। এ-সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন জমিয়তে ইসলামির বুরহান উদ্দিন রব্বানি এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হিযবে ইসলামির গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার। তালেবান ক্ষমতা দখলের পর প্রেসিডেন্ট হন মোল্লা মুহাম্মদ উমর এবং প্রধানমন্ত্রী হন মোল্লা বুরহান উদ্দিন। আহমদ শাহ মাসউদ তখনো প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিন্তু হেকমতিয়ার ও তালেবান নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অব্যাহত ছিলো এবং তিনি তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। যদিও তাঁরা উভয়ই তালেবান সরকারবিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটে ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আর কী জানেন? এখন তাঁর সম্পর্কে বলি। মনে করুন, তাঁর এলাকার আশেপাশে প্রায় তিনশোটি ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান রয়েছে। এগুলো কোনো এলাকা বা গাড়িবহরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। রুশ বাহিনী তখন জানালো, আমরা কীভাবে এই বিপর্যয় থেকে রেহাই পেতে পারি? আমরা তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারা আহমদ শাহ মাসউদের কাছে এই মর্মে প্রতিনিধিদল পাঠালো যে আমরা আপনার সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি-বৈঠক করতে চাই। আহমদ শাহ মাসউদ আলেমদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আলেমগণ জানালেন, যুদ্ধবিরতি বৈঠক করতে কোনো সমস্যা নেই। রুশ বাহিনী তাঁকে আহ্বান জানালো, আপনি আমাদের কাছে আসুন। তিনি জানালেন, না, আমি আপনাদের কাছে আসতে পারবো না। রুশ বাহিনী জানালো, তাহলে আমরা পথের মাঝামাঝি স্থানে মিলিত হয়ে বৈঠক করি। আহমদ শাহ মাসউদ জানালেন, না, বরং আপনারা আমার কাছে আসুন। রুশরা জানালো, তাহলে আপনি আমাদের কাছে (বৈঠকের নিরাপত্তাবিধানের জন্যে) জামানত রাখুন। আহমদ শাহ মাসউদ জানালেন, না, আমি আপনাদের কাছে কোনো জামানত রাখতে পারবো না। এমনিতেই আপনারা আমার কাছে আসবেন। ফলে রুশ কমান্ডাররা নীচ-হেয় হয়ে আহমদ শাহ মাসউদের সামনে উপস্থিত হলো। তিনি তখন অনেক পরিণত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছে তখন ৩৭ বছর। পনেরো বছর আগে ২২ বছর বয়সে তিনি জিহাদ শুরু করেছিলেন। তিনি ও রুশ বাহিনীর জেনারেল বা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রথম রাত গেলো, দ্বিতীয় রাত গেলো, তৃতীয় রাত গেলো। কিন্তু কোনো সমাধানে পৌঁছানো গেলো না। রুশ জেনারেলরা বললেন, আপনি হয়তো আমাদের প্রকৃত অবস্থা

২০০১ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর (টুইন টাওয়ারে হামলার মাত্র দুই দিন আগে) উত্তর আফগানিস্তানের তাখার প্রদেশে খাজা বাহাউদ্দিন এলাকায় এক আত্মঘাতী হামলায় আহমদ শাহ মাসউদ নিহত হন। এই হমলার জন্যে আল-কায়েদাকে অভিযুক্ত করা হয়। কারণ ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলো। এর আগে বহুবার কেজিবি, আইএসআই, আফগান কমিউনিস্ট কেএইচএডি, তালেবান ও আল-কায়েদা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর জন্মস্থান বাজারাকেই তাঁকে দাফন করা হয়।

কমিউনিস্টবিরোধী যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার জন্যে তাকে 'শেরে পানশির' বা পানশিরের সিংহ নামে ডাকা হয়। তিনিই একমাত্র আফগান নেতা যিনি কখনো আফগানিস্তানের বাইরে থাকেন নি। ২০০১ সালে হামিদ কারজাইর সরকার তাকে 'আফগানিস্তানের জাতীয় বীর' উপাধিতে ভূষিত করে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক। তাঁর স্ত্রী সাদিকা মাসউদ ২০০৫ সালে ফরাসি ভাষায় রচিত তাঁর *Pour l'amour de Massoud* (মাসউদের ভালোবাসার জন্যে) গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রিয়তম স্বামীর ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা দেন।

জানেন না; কী ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থায় আমরা আছি। আমাদের মানসিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে। এই নির্বোধ উন্মাদ নেতা (ব্রেজনেভ[৩৩]) আমাদের এই অবস্থায় নিক্ষেপ করে আমাদের ত্যাগ করেছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন)। আমাদের মনে হচ্ছে, আমাদের পায়ে বেড়ি পরানো হয়েছে। আমরা বন্দি হয়ে পড়েছি। আমরা নিজেদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে চাই।

তারপরের রাত থেকে তাঁরা যা কিছু আলোচনা করেন তা আমি লিখে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। পরে ভাবলাম তা ঠিক হবে না। এটা হবে একটা নীচু ধরনের কাজ। তাছাড়া এতে মজলিসের আমানত রক্ষা হবে না।

তাঁরা একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করলেন। পানশিরে ছয়মাস যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। আহমদ শাহ মাসউদ মুজাহিদদের পানশিরের বাইরে পাঠাতে লাগলেন। তারা অন্যান্য এলাকায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং পানশিরে ফিরে আসবে। পানশিরে ছয়মাস যুদ্ধ নিষিদ্ধ। পানশির এবং সালাং গমনের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পাহাড় আছে। তিনি মুজাহিদদের একটি দল বা সেনাদের একটি কোম্পানি সালাংয়ে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে অভিযান চালায় এবং পানশিরে ফিরে আসে। এদিকে পানশিরের আকাশে বিমান চলাচল নিষিদ্ধ। ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ নিষিদ্ধ। ফলে রুশরা বুঝতে পারে, তাদের যুদ্ধবিরতির চুক্তি লাভজনক হয় নি।

---

[৩৩] পুরো নাম লিউনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ। ১৯০৬ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর রাশিয়ার কামিয়ানস্কিতে (বর্তমানে দিপ্রোদজারঝিনস্ক, ইউক্রেন) জন্মগ্রহণ করেন। দিপ্রোদজারঝিনস্ক মেটালারজিক্যাল টেকনিকাম থেকে ১৯৩৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন শেষে ধাতব প্রকৌশলী হিসেবে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জরুরিভাবে সামরিক বাহিনীতে প্রেরিত হন এবং ১৯৪৬ সালে মেজর জেনারেল পদবি নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন এবং এবং ১৯৬৪ সালে মহাসচিব হিসেবে নিকিতা ক্রুশ্চেভের স্থলাভিষিক্ত হন। ব্রেজনেভ ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৪ থেকে ১০ই নভেম্বর ১৯৮২ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব ছিলেন। মূলত কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাই দেশ পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা ছিলেন তাঁদের হাতের পুতুল। কারণ কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিবের চেয়ে বড়ো কোনো পদ ছিলো না। ব্রেজনেভ জোসেফ স্টালিনের পর সর্বাধিক আঠারো বছর ক্ষমতায় থেকে ১৯৬৪ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেন। তিনি সামরিক খাতে উল্লেখযোগ্য হারে ব্যয় বৃদ্ধি করেন যা ছিলো মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৫০%। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসনে ভূমিকা রাখতে না পেরে স্থবির অর্থনীতির জন্ম দেন। আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ১৯৮২ সালের ১০ শে নভেম্বর মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আন্দ্রোপভের[৩১] মৃত্যু হয় এবং তারপর চেরনেনকো[৩২] ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু আপনারা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহপাকের কৌশল দেখেন। সুবহানাকা ইয়া রব! আপনারা কি কখনো শুনেছেন মাত্র চার বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনজন নেতার মৃত্যু হয়েছে? আফগানিস্তানের মজলুম ও নির্যাতিতদের দোয়া আল্লাহপাক এভাবেই কার্যকর করেছিলেন। মাত্র চার বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনজন নেতা মারা গেলেন। স্টালিন[৩৩] তিরিশ বছর রাশিয়া শাসন করেন। [স্টালিনের পর জর্জি মালেন্‌কভ কয়েক মাস পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং ৫ই মার্চ, ১৯৫৩ থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ এই দুই বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। পার্টির ক্ষমতা নিয়ে ক্রুশ্চেভের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলো।] তারপর আসেন ক্রুশ্চেভ[৩৪]। তিনি শাসন করেন দশ বছর। ক্রুশ্চেভের পর প্রেসিডেন্ট হন ব্রেজনেভ। ব্রেজনেভ রাশিয়া শাসন করেন পনেরো বছর। [তিনি মূলত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আঠারো বছর দেশ শাসন করেন।] তারপর তিনি মাত্র এক বছর বেঁচে ছিলেন। (তিনিই আফগানিস্তানে আক্রমণ করার জন্যে রুশ সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন।) তারপর ক্ষমতায় আসেন আন্দ্রোপভ। দেড় বছরের মাথায় তিনি মারা যান। তারপর আসেন

---

[৩১] পুরো নাম ইউরি ভ্লাডিমিরোভিচ আন্দ্রোপভ। ১৯১৪ সালের ১৫ই জুন রাশিয়ার স্টানিট্‌সা নাগুট্‌স্কায়া অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ই নভেম্বর ১৯৮২ থেকে ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব ছিলেন। এ-দিনেই মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

[৩২] পুরো নাম কোন্‌স্টান্‌টিন ইউস্টিনোভিচ চেরনেনকো। ১৩ই ব্রেুয়ারি ১৯৮৪ থেকে মৃত্যুর দিন ১০ই মার্চ ১৯৮৫ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির মহাসচিব ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯১১ সালে।

[৩৩] পুরো নাম উওসেফ ভিসারিওনভিচ জুগাশ্‌ভিলি। আমাদের দেশে জোসেফ স্টালিন বা স্ত ালিন নামে পরিচিত। ১৮৭৯ সালে জর্জিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। রুশ কমিউনিস্ট একনায়ক। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে কর্তৃত্বময় ও প্রভাবশালী নেতা। বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২২ সালের বলশেভিক দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালের লেনিনের মৃত্যুর পর কামিনিয়েভ ও জিনোভিয়েভের সঙ্গে যৌথভাবে লেনিনের স্থলাভিষিক্ত হন। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রৎস্কি ও জিনোভিয়েভকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে ১৯২৭ সালে তিনি পার্টির সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সোভিয়েত ইউনিয়নে আমলাতন্ত্রের প্রবর্তক হিসেবে স্টালিনের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে।

[৩৪] পুরো নাম নিকিতা সের্গেইয়েভিচ ক্রুশ্চেভ (ক্রুশ্চেভ লেখা হলেও উচ্চারণ ক্রুশ্‌শোফ্)। ১৮৯৪ সালের ১৭ই এপ্রিল রাশিয়ার ডিমিট্রিইয়েভ্‌স্কি এলাকার কালিনভ্‌কা গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯১৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ পান। ১৯৩৮ সালে ইউক্রেনের আঞ্চলিক কমিটির ফার্স্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৩ থেকে ১৪ অক্টোবর ১৯৬৪ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পার্টিপ্রধানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী হয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৬৪ সালে উভয় পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯৭১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়।

চেরনেনকো এবং এক বছরের মাথায় মারা যান। এভাবেই মাত্র চার বছরে পরপর তিনজন নেতা মৃত্যুর মিছিলে যোগ দেন। আফগানিস্তানের নির্যাতিত নর-নারীর আহাজারি আসমানে পৌঁছেছিলো এবং তাদের ওপর শাস্তি আপতিত হয়েছিলো। আল্লাহপাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

চেরনেনকো ক্ষমতায় এসেই ঘোষণা করলেন, এইভাবে মার খাওয়া আমাদের জন্যে পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। আপনারা নতুনভাবে কমিটি গঠন করুন। এই কমিটি আহমদ শাহ মাসউদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করবে। তারা নতুন কমিটি গঠন করে। এই নতুন কমিটি যুদ্ধবিরতির জন্যে কতোগুলো শর্ত লিপিবদ্ধ করে। কমিটি শর্তসম্বলিত কাগজপত্র আহমদ শাহ মাসউদের কাছে প্রেরণ করে এবং এই মর্মে দুঃখ প্রকাশ করে যে, আগের কমিটি ধোঁকা দিয়েছিলো এবং শর্ত ভঙ্গ করেছিলো। এবার আমরা নতুনভাবে কমিটি গঠন করে নতুন শর্ত তৈরি করেছি। আমরা আগামীকাল যুদ্ধবিরতির শর্তগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্যে আপনার সঙ্গে বসতে চাই। আহমদ শাহ মাসউদ জানালেন, আমরা আগামীকাল আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারবো না। ইনশাআল্লাহ, দুই সপ্তাহ পর আমরা আপনাদের সঙ্গে বসবো। এরপর তিনি কৃষকদেরকে গম ও অন্যান্য শস্য জমিয়ে রাখতে আদেশ দিলেন। তিনি তাদের বললেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আপনারা গম ও অন্যান্য শস্য সংগ্রহ করে ঘরে তুলে রাখুন।

দুই সপ্তাহ পর তিনি কালাশনিকভ হাতে নিলেন। এই কালাশনিকভগুলো ছিলো রুশ বাহিনী থেকে গনিমত হিসেবে পাওয়া। সামরিক পোশাক পরলেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গে যে-দলটি ছিলো তাঁরা সামরিক পোশাক পরতেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে ফজরের নামায থেকে নিয়ে আসরের নামায পর্যন্ত সামরিক পোশাক পরা বাধ্যতামূলক ছিলো। সামরিক পোশাক পরে কালাশনিকভ হাতে নিয়ে তাঁরা সেই কমিটির অফিসে গেলেন। কাদের কমিটি ছিলো এটা? এটা সেইসব সামরিক অফিসারদের কমিটি ছিলো যারা আটলান্টিক চুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোটা বিশ্বের মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলো। আহমদ শাহ মাসউদ বলেন, 'আমি তাদের শর্তাবলির কাগজপত্র হাতে নিলাম এবং লাল কালি দিয়ে দাগালাম। তারপর নতুন করে কঠিন কতোগুলো শর্ত লিখলাম। আমার শর্তগুলো ছিলো আগের শর্তগুলোর তুলনায় বহু বহুগুণ কঠিন। আমি কাগজগুলো এগিয়ে দিলাম, তারা সেগুলো হাতে নিলো। তারা লাল দাগাদাগি দেখলো এবং তাদের কাগজগুলোর করুণ অবস্থা দেখলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নতুন শর্তগুলোর দিকে তাকালো। এরপর তারা ফুলে উঠলো, ফুঁসে উঠলো, লাল হয়ে উঠলো ও জ্বলে উঠলো।' তারা আহমদ শাহ মাসউদকে বললো, 'আমাদেরকে একটু বাইরে যাওয়ার সুযোগ দিন। আমরা সিগারেট খাবো।' আহমদ শাহ মাসউদ বললেন, 'ঠিক আছে।

আপনারা যান।' তারা গলায় শিকার আটকে-যাওয়া সাপের মতো গক গক করতে করতে বেরিয়ে গেলো। সিগারেট খেলো। 'এই ব্যাটার সঙ্গে আমরা কী আর আলোচনা করবো। যাও তোমরা সবাই ঘরে ফিরে যাও', তারা বলে। তারা ফিরে এসে আবার আগের জায়গায় বসে। এক সামরিক কর্মকর্তা—জেনারেল বা এ-পর্যায়ের একজন—কাগজগুলো হাতে নেয়। সে নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; কাগজগুলো আহমদ শাহ মাসউদের ওপর ছুঁড়ে মারে। আহমদ শাহ মাসউদ কাগজগুলো হাতে নিয়ে মুঠি বানিয়ে সেই রুশ সামরিক কর্মকর্তার মুখে আঘাত করে বলেন, 'বেয়াদব, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।' তখন অন্য সামরিক কর্মকর্তা বলে, 'তাকে আপনি সুযোগ দিন। সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।' আহমদ শাহ মাসউদ বললেন, 'এই বেয়াদব ঘর থেকে বেরিয়ে না গেলে আমাদের পক্ষে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর রাসুলের একজন সৈনিক এক রুশ জেনারেলকে বৈঠক থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করলেন! ইসলাম তার সৈনিককে জিহাদের মাধ্যমে কী মর্যাদাই না দিয়েছে। তারা সেই জেনারেলকে বৈঠক থেকে বের করে দিয়ে আবার বসলো। দ্বিতীয় দিন তারা আহমদ শাহ মাসউদকে একটা চিঠি লিখলো, 'আমরা কালাশনিকভের ভয়ে শঙ্কিত। তাছাড়া এইসব শর্ত পক্ষপাতমূলক ও বিধ্বংসী। শর্তগুলো মানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' কমিটির প্রধান আহমদ শাহ মাসউদের কাছে আসে। তাঁকে অনুরোধ করে, 'আপনি অনেক কঠিন শর্ত দিয়েছেন। আপনি আমাদের প্রতি নরম হোন।' সে আরো নানা ধরনের অনুরোধ জানায়। ইয়া সালাম! আহমদ শাহ মাসউদ তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হন। তিনি শর্তগুলো শিথিল করেন এবং একটি বা দুটি শর্ত কেটে দেন। তারা আবার আলোচনায় বসে এবং তারা এটাকে রাশিয়ার সম্মানের জন্যে হুমকি মনে করে।

এক উপত্যকায় একজন সামান্য মুজাহিদ। এখন পর্যন্ত সেখানে গাড়ি প্রবেশ করে না। সেখানকার জমি এখনো আবাদ হয় নি। রুশরা ভাবে, এই ব্যাটা যা ইচ্ছা তাই আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে, তা হতে পারে না। আহমদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী সপোলভ নিজে সেখানে আসে। যুদ্ধের সার্বিক পরিকল্পনা করতে সে তার সঙ্গে দুইজন জেনারেলকে (বা দুইজন মার্শাল) নিয়ে আসে। আফগানিস্তানে নিযুক্ত তাদের গোয়েন্দারা তাদেরকে জানায় যে, 'আহমদ শাহ মাসউদকে দেশের সব যুবকই পছন্দ করে।' আলহামদুলিল্লাহ, আপনরা যুবকদের পকেটে আহমদ শাহ মাসউদের ছবি দেখতে পাবেন। রুশরা বলে, তাহলে তো সে তার জাতির লোক। হ্যাঁ তারা সত্যই বলেছিলো এবং সেটাই ছিলো বাস্তব।

তারা পরিকল্পনা করে যে পানশিরে একান্ন হাজার রুশ সেনা প্রবেশ করবে। অথচ সেখানে ছিলো মাত্র চার হাজার মুজাহিদ। প্রথম তিনদিনের প্রতিদিন ছয়শো বিমান হামলা হবে। প্রতিটি হামলায় অংশ নেবে প্রায় তিরিশটি বিমান। অর্থাৎ, আপনি কল্পনা করুন... ছয়শো হামলা, অর্থাৎ পানশিরে একদিনে চব্বিশ হাজার টন বিস্ফোরক ফেলা হবে। সংখ্যাটি ভুল নয়, পানশিরে একদিনে বিস্ফোরক ফেলা হবে চব্বিশ হাজার টন। এক কেজি বিস্ফোরক দিয়ে প্রায় বিশটি বোমা বানানো যায়। তাহলে একটন দিয়ে কতোগুলো বোমা বানানো যাবে? বিশ হাজার বোমা বানানো যাবে। এই সংখ্যাটিকে চব্বিশ হাজার দিয়ে গুণ করুন। দেখুন কতো হয়। মানে ৪৮,০০,০০,০০০টি বোমার সমপরিমাণ বিস্ফোরক ফেলা হবে প্রতিদিন। এর ফলে কী ঘটে? বরফ গলে এলাকা প্লাবিত হয়। কাহিনি অনেক লম্বা।
যাই হোক। মুজাহিদরা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্যে উপত্যকায় মাইন পুঁতে রাখে। রুশরা তাদের ধারণামতে যে-পথ দিয়ে পানশিরে প্রবেশ করবে সে-পথে মুজাহিদরা সারি সারি মাইন বিছিয়ে রাখে। উপত্যকার বাইরেও তারা মাইন বিছিয়ে রাখে। উপত্যকার ভেতরে তারা ওত পেতে থাকে ট্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্যে। রুশরা একই সঙ্গে ওপর থেকে বিমান হামলা করছিলো এবং স্থলপথ দিয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। প্রথম দিন ট্যাঙ্কগুলো প্রবেশ করে। এদিকে পানশিরে মুজাহিদদের ধ্বংসের খবর শোনার জন্যে সপোলভ তার আস্তানায় বসে ছিলো। তবে তার কাছে মুজাহিদদের ধ্বংসের কোনো খবর আসে না। খবর আসে, 'আমরা পানশিরে প্রবেশ করে মাইন ছাড়া আর কিছুই পাই নি। আমাদের অনেক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গেছে।' এই খবর শোনার পর সপোলভ এতোটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে তার হাত থেকে কলম পড়ে যায়। কর্মকর্তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার মনোভাব কি, কী মনে হয় আপনার?' সে বলে, 'আমরা যুদ্ধে হেরে গেছি।'
সেদিন রাতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে রুশ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত এক নৈশভোজের অনুষ্ঠান ছিলো। যথারীতি সেখানে রুশ রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন। ফরাসি রাষ্ট্রদূত রুশ রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি পানশিরের সবাইকে জবাই করে ফেলেছেন?' জবাবটা রুশ রাষ্ট্রদূতের জানা ছিলো। তাই সে তার মাথা নিচু করে রাখে। চা-পানপর্বের আগেই সে জলসা থেকে বেরিয়ে যায়।
যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ছয়মাস পেরিয়ে যায়। রুশ বোমারু বিমান একেক দিন কাবুলের খাজারাওয়াশ থেকে, বাগরাম থেকে, কালাদিহ থেকে আসতো এবং পানশিরে হামলা করে ফিরে যেতো। আবার রাশিয়া থেকেও একদিনের জন্যে আসতো বোমারু বিমান। সকালে আসতো এবং পানশিরে হামলা করে

রাশিয়ায় ফিরে যেতো। সকালে যখন বিমান আসতো, বারওয়ান ও কাবিসার বাসিন্দারা বিমান দেখার জন্যে কান্নাকাটি করতো। তারা থাকতো পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড়ের চূড়ায় বিছানো থাকতো মাইন। সেখানে রুশ কমান্ডোরা নামতো। পাহাড়ের চূড়াতেই তারা কমান্ডোদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। কমান্ডোরা তাদেরকে উপত্যকার দিকে নিয়ে আসতো। উপত্যকায় তাদের ওপর বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ করতো। ট্যাঙ্কগুলো উপত্যকায় প্রবেশ করে তাদেরকে পুড়িয়ে মারতো।

রাশিয়ার পরাজয় স্বীকার

জিহাদ! জিহাদ আপনাদের অপছন্দ। আল্লাহপাক বলেছেন—

كتب عليكم القتال وهو كره لكم

'তোমাদের ওপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের অপছন্দ।' [সুরা বাকারা : আয়াত ২১৬]

আল্লাহপাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন। তাদের ধৈর্যের কারণে আল্লাহপাক তাদেরকে সাহায্য করেছেন। কেউ কেউ বলেন, রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সরে এসেছে। কে আপনাকে বলেছে রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে সরে এসেছে? আফগানিস্তানের ভেতরে রাশিয়ার দর্প চূর্ণ হয়েছে। তারা সেখানে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। মিখাইল গর্বাচেভ[৩৫] বলেছেন, আফগানিস্তানে আমাদের প্রবেশ ছিলো ভুল পদক্ষেপ। আফগানিস্তানে প্রবেশের ফলে আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছে। রুশ বাহিনীর কমান্ডার, তিনিও আফগানিস্তান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, বলেন, এই দিনটির জন্যেই আমার কয়েক বছর আগে অপেক্ষায় ছিলাম।

রুশ টেলিভিশনে এক সৈনিকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাংবাদিকরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থা কেমন ছিলো? সৈনিকটি বলে, আমরা যখনই 'আল্লাহু আকবার' শুনতাম, আমাদের কাপড়ে পেশাব করে দিতাম।

---

[৩৫] মিখাইল সের্গেইয়েভিচ গর্বাচেভ রাশিয়ার স্টাভ্রোপোল ক্রিইর প্রিভোলনোইতে ১৯৩১ সালের ২রা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট (১৫-০৩-১৯৯০-২৫-১২-১৯৯১)। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য (২৭-১১-১৯৭৯-২৪-০৮-১৯৯১)। ২০০৮ সালে তিনি এবং আলেক্সান্ডার লেবেদেভ ইনডিপেনডেন্ট ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব রাশিয়া গঠনের ঘোষণা দেন। এর আগে তিনি ২০০১ সালে তিনি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং ২০০৭ সালে ইউনিয়ন অব সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটস্ শুরু করেন।

আপনারা কি মনে করেন বিষয়টি খুব সহজ ছিলো? রাশিয়া ছিন্নবিছিন্ন হয়েছে। ইমাম শামেলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে প্লাপোভ বলেন, আমরা ককেশাসে যে-পরিমাণ সৈন্য হারিয়েছি তারা মিসর থেকে জাপান পর্যন্ত সব দেশ জয় করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। রুশ বাহিনী যদি আফগানিস্তানে থাকতো তাহলে রাশিয়া ধ্বংস হয়ে যেতো। ফ্রাঁসোয়া মিটারেন্ড[৩৬] তাদেরকে বলেন, আফগানিস্তান রুশ সাম্রাজ্যের দেহে এক ভয়ঙ্কর কর্কট, তা দিন দিন তাদেরকে খেয়ে ফেলছে।

আমেরিকা... আমেরিকা আফগানদেরকে ভয় পেতে শুরু করে। তারা তখনো আফগানিস্তানের ভেতরে। কিছু বই লেখা হয় এবং সেগুলো আমেরিকার বাজারে ছড়িয়ে দেয়া হয় : আফগানরা রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দক্ষিণে যেসব মুসলমান রয়েছে তাঁদের মাধ্যমে তারা রুশ সাম্রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর তারা ইউরোপে প্রবেশ করবে। তারপর, হে আমেরিকা, তোমাকেও ইউরোপের মধ্যস্থলে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হবে।

ইউরোপীয়রা বললো, তুর্কিরা আবার ফিরে এসেছে। আফগানরা ফিরে এসেছে, যেনো আবার তোমরা পাঁচ শতাব্দীব্যাপী তাদেরকে কর জিযিয়া প্রদান কর।

তাই গোটা পৃথিবী আফগানদের এই 'বেড়ে যাওয়া' নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টায় একত্র হয়। হ্যাচার ম্যান, এক বিখ্যাত আমেরিকান ইহুদি, তিনি মার্কিন সরকারকে বলেন, What we have done? We have awakened the giant! আমরা কী করেছি? আমরা তো দৈত্যদেরকে জাগিয়ে তুলেছি। আফগানিস্তানে জিহাদ ছিলো ধৈর্য, কুরবানি, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, দীনের জন্যে অহমিকা ও আত্মদানের এক উৎকৃষ্ট জীবন্ত উদাহরণ। তা ছিলো এই দীনের শত্রুদের জন্যে একটা শিক্ষা। একারণেই রুশ বাহিনী আফগানিস্তান থেকে পিছু হটার পর বড়ো বড়ো সোভিয়েত নেতা বৈঠকে একত্র হন এবং জনমের জন্যে তওবা করেন। তারা স্বীকার করেন যে, আমরা সাধারণত সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর দেশে লাল সেনাদের পাঠাবো না। এখন রাশিয়ার দক্ষিণ দিকে ইসলামি ভূখণ্ডগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে। তাজিকিস্তানে সত্তর বছর ধরে কুরআনের নাম শোনা যায় নি, অথচ গত পাঁচ মাসে আরবি ভাষায় কুরআন পাঠ শুরু হয়েছে এবং আরবি ভাষায় আযান দেয়া শুরু দেয়া হয়েছে।

---

[৩৬] পুরো নাম ফ্রাঁসোয়া মরিস অড্রিন মেরি মিটারেন্ড। জন্ম ২৬ শে অক্টোবর, ১৯১৬ সালে ফ্রান্সের জার্নাকে এবং মৃত্যু ৮ই জানুয়ারি ১৯৯৬ সালে প্যারিসে। ফ্রান্সের একুশতম প্রেসিডেন্ট (২১ শে মে, ১৯৮১-১৭ই মে ১৯৯৫)।

সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ

জিহাদ... হ্যাঁ, কঠিনই বটে। জিহাদে আছে ত্যাগ ও তিক্ততা। তবে তা মিষ্ট। জিহাদের ফল হচ্ছে দুনিয়ার সৌভাগ্য ও আখেরাতের সৌভাগ্য। বিশ্বের সব মুসলিম আফগানদের পাগড়িকে সম্মান জানাতে তাদের মাথা উঁচু করেছেন। এই পাগড়ি বিশ্বের সব জায়গায় সম্মানের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একবার আফগানি টুপি পরে যুক্তরাষ্ট্রে রাস্তায় হাঁটছিলাম। মার্কিনরা দেখলাম আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, লোকটাকে তো আফগান মনে হচ্ছে।

রব্বানী বসে ছিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্মাকোস্ট (Michael Hayden Armacost) এলেন। তিনি রব্বানীকে সালাম দিলেন। রব্বানী তাঁকে সালাম দিতে দাঁড়ালেন। আর্মাকোস্ট বললেন, না, না, জনাব, আপনি দাঁড়াবেন না। আপনি দাঁড়াচ্ছেন কেনো। আপনি কারো জন্যে দাঁড়াবেন না, আপনার জন্যে সবাই দাঁড়াবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্মাকোস্ট রব্বানীকে বলছেন, জনাব, আপনি দাঁড়াবেন না।

এটা তায়েফের ঘটনা। রাশিয়া মরণপণ লড়াইয়ের পর মুজাহিদদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায়। রব্বানী তাদেরকে জানান, আমাদের কয়েকটি শর্ত আছে। রাশিয়া জানায়, আমরা আমাদের কোনো এলাকায় আলোচনায় বসতে পারি। রব্বানী বলেন, না। ইসলামি কোনো দেশে বসা যেতে পারে। তা সৌদি আরব বা পাকিস্তান হতে পারে। এই কথা বলে তিনি হেঁটে চলে যান। কিছুদিন পর রাশিয়া জানায়, আমরা সৌদি আরব বা পাকিস্তানে বসতে রাজি আছি। পাকিস্তান রাশিয়াকে জানায়, রব্বানী এখন ওমরা পালন করতে সৌদি আরবে রয়েছেন। আপনারা সৌদি আরবে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। রাশিয়া সৌদি আরবে রব্বানীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা জানায়, আপনার সঙ্গে দেখা করতে সৌদি আরবে আসতে আমরা প্রস্তুত। রব্বানী তাদেরকে জানান, আপনারা আগে সৌদি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সরকার আপনাদেরকে এখানে আসার অনুমতি দেয় কিনা দেখুন। কারণ, আপনাদের তো ভিসা নেই। রাশিয়া সৌদি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আপনারা কি আমাদেরকে সৌদি আরবে প্রবেশের অনুমতি দেবেন? আমরা রব্বানীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। রাশিয়া তখন যুদ্ধে বিপর্যস্ত। সৌদি সরকার জানায়, আপনারা সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারেন। রাশিয়ার প্রতিনিধিদল যখন রব্বানীর সঙ্গে দেখা করে, রব্বানী তাদেরকে বলেন, তিনটি শর্তে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি আছি।

১. আপনারা আমাদের পূর্বে বৈঠকে প্রবেশ করবেন এবং আমরা প্রবেশ করার পর আপনারা উঠে দাঁড়াবেন।

২. আমরা আপনাদেরকে সালাম দেবো না।
৩. আপনারা ভবিষ্যতে কখনো সরকারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না। [নাজিবের সরকারের কথা বলা হচ্ছে।] এই বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না। আপনারা কি রাজি আছেন?

হ্যাঁ, রাশিয়া রাজি হলো। তারা তখন বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত। তারা মুজাহিদদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায়। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদরা আলোচনায় বসলেন এবং স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, এই দিনের পর তাঁরা কখনো রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না। রাশিয়ার প্রতিনিধিদল বৈঠক শেষে যখন বেরিয়ে এলো, তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে এক টুকরো কাগজও নেই।

এই সম্মান, কীসের সম্মান এটা? এই উচ্চ মর্যাদা, এই প্রশংসা, এই আত্মসম্মানবোধ কীসের জন্যে? একারণেই গোটা পৃথিবী আফগানদের জিহাদের ফলাফলে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এটাই বাস্তবতা। তারা সব সময় আফগান জিহাদ এইভাবে শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলো।

ইসলামি পরিভাষার প্রত্যাবর্তন

পশ্চিমা বিশ্ব ও আমেরিকা ভেবেছে আফগানিস্তানের বিষয়টি হচ্ছে রাশিয়ার বাড়াবাড়ি ও তাদের বিলাসিতা। এটা রাশিয়ার ব্যাপক বিলাসিতা ছাড়া কিছু নয়। রাশিয়ার শক্তির বাড়াবাড়ি এবং তাদের অর্থের বিলাসিতা। কিন্তু আসলে কি তাই? আল্লাহপাক বলেছেন, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, বিজয় ও মর্যাদা গ্রহণ করো। আমি জানি না তারা কিভাবে ধৈর্য ধারণ করেছে।

আমি যখন সিরাতের গ্রন্থগুলোতে পড়তাম, মুসলিম সেনাবাহিনী কোনো বেতন ছাড়াই যুদ্ধ করেছেন, আমার বিশ্বাস হতে চাইতো না! কীভাবে আপনি বেতন ছাড়া জিহাদ করবেন? কোনো এক তারকা বা দুই তারকার প্রতীক নেই, কোনো ব্যাজ নেই, কোনো পদবি নেই, কোনো ফিতা নেই। কীভাবে তারা জিহাদ করে? আমি অর্ধমিলিয়ন আফগানকে জিহাদ করতে দেখেছি এবং কমান্ডারের কাছে তাদের চূড়ান্ত চাওয়া হচ্ছে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তারা পর্যাপ্ত খাবার পেতো না। অথচ তারা জীবনে অনেক মূল্যবোধ ফিরিয়ে এনেছে। 'মুজাহিদ' শব্দটা তারা বিশ্বের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছে। তবে কতিপয় আরব সাংবাদিক তাদেরকে 'মুজাহিদ' স্বীকার করতে ও স্বীকৃতি দিতে নারাজ। পশ্চিমারা তাদেরকে যে-নামে অভিহিত করতো তারাও তাদেরকে সে-নামে অভিহিত করতো। তারা তাদেরকে বলতো বিদ্রোহী... ইত্যাদি। কম সংখ্যক আরবই এই ধারণা পোষণ করতো, না... তারা তো বিদ্রোহী। আরবদের হয়তো বুঝে আসবে!

আরবরা তাদেরকে বললো, 'তোমরা তো শরণার্থী।' আফগানরা বললো, 'না, আমরা মুহাজির। আমরা শরণার্থী নই। আমরা পালিয়ে এসে খাদ্যের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করি নি।'
প্রথম দফায় পাঁচ মিলিয়ন মুসলমান তাদের ঈমানকে সঙ্গী করে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে চলে যায়। তাদের উচিত ছিলো ঈমানের সঙ্গে আফগানিস্তানের ভেতরেই থাকা। সেখানেই তারা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারতো। কিন্তু তারা ঈমান ও দীনকে সঙ্গী করে পালিয়ে যায়, যাতে তারা আফগানিস্তানের বাইরে থেকে জিহাদে সহযোগিতা করতে পারে। 'গনিমত', 'ফায়', 'ইমারত' ইত্যাদি পরিভাষা তো আমরা ভুলেই গেছি।
আমি আমাদের এক অধ্যাপকের একটি বই পড়েছিলাম। সেই অধ্যাপক এটা লিখতে লজ্জাবোধ করেছেন যে, জিহাদের একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে 'সাল্‌ব' বা নিহত শত্রুর সব সামগ্রী নিয়ে নেয়া। 'সাল্‌ব' কথাটি লিখতে তিনি লজ্জাবোধ করেছেন। কীভাবে তিনি এটি লিখবেন? কেননা, পশ্চিমারা এর অর্থ করবে 'লুণ্ঠন বা ছিনতাই করা'। ['সাল্‌ব'-এর শাব্দিক অর্থ লুণ্ঠন করা; ছিনতাই করা; ছিনিয়ে নেয়া।] অথচ হাদিসে এসেছ, من قتل قتيلا فله سلبه 'যে কোনো শত্রুকে হত্যা করবে সে তার সামগ্রীর মালিক হবে।' অর্থাৎ আমরা তার টাকা-পয়সা, তার তরবারি ও অস্ত্র এবং তার ঘোড়া নিয়ে নেবো। নাউযুবিল্লাহ! কীভাবে আমরা পশ্চিমাদের জন্যে লজ্জাবোধ করি? অধ্যাপকদের লজ্জা হয় মিসকিনদের জন্যে আর আমরা লজ্জিত হই অধ্যাপকদের জন্যে। আমরা তাঁদের মতাদর্শের জন্যে লজ্জিত হই। তাঁরা পশ্চিমাদের কারণে তাঁদের দীন প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন, তাঁদের রবের আদেশ প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন।
আফগানরা আরেকবার নতুনভাবে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তারা তাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছে, এই ইসলামি জিহাদি রাষ্ট্রের আবশ্যক কর্তব্য হলো কাবুলকে মুক্ত করার পর বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করা। তারা তাদের সংবিধানে এই কথা লিখেছে। হে বিশ্ববাসী, তারা তোমাদের সঙ্গে লড়াই করবে। হে পশ্চিমা বিশ্ব, তারা তোমাদের সঙ্গেও লড়াই করবে। আর হে ইহুদিরা, গোটা পৃথিবী তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন বুদ্ধিজীবীরা বললেন, না, না, সংবিধানের এই নীতি পাল্টাতে হবে। আমার বুঝে আসে না, ইসলামি আকিদায় বিশ্বাসীরা, দীনে বিশ্বাসীরা কীভাবে এই শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছালেন?

মুসলিম সমাজ-প্রতিষ্ঠার কৌশল : দাওয়াত ও তরবিয়ত

আমি একটি মিশন নিয়ে বের হয়েছি : মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা।—ইসলামি দাওয়াত ব্যতীত মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। মুসলিম যুবকদের প্রথমে আল্লাহর দীনের ওপর গড়ে তুলতে হবে; তাদেরকে আল্লাহর ভয় ও পরহেযগারি শেখাতে হবে; নামায, রোযা, দৃষ্টি অবনত রাখা, জিহ্বা হেফাযত করা, পাপ থেকে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেফাজত করা ইত্যাদি শেখাতে হবে। তাদেরকে আত্মসম্মানবোধ, ভয় থেকে মুক্তি, বিশেষ করে জীবিকার ভয় থেকে মুক্তি, একনিষ্ঠ ইমানী চেতনার ওপর গড়ে তুলতে হবে। কেননা যা ঘাড় ও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয় তা হচ্ছে জীবিকা-রোজগারের ভয়। সংবাদবিনিময় ও গোয়েন্দাকার্যক্রম এমন এক জটিলতায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তার সমাধান সম্ভব নয়। জটিল অপচ্ছায়া মুসলিম যুবকদেরকে সবসময় সর্বত্র তাড়িয়ে বেড়ায়। সুতরাং ভয় থেকে মুক্তির বিকল্প নেই; জীবিকার ভয়, জীবনের ভয় ও রোজগারের ভয় থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। এভাবে তরবিয়ত দেয়ার পরই মুসলিম যুবকেরা ইসলামি স্রোতধারা, ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। এটা তখনই সম্ভব হয়ে যখন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সমান ধারাবাহিকতায় জিহাদ অব্যাহত থাকবে। সমাজে ইসলামি স্রোতধারা গতিময় হওয়ার ফলে ইসলামি উম্মাহর শক্তির বিকাশ ঘটবে। ইসলামি আন্দোলনের সততা, একনিষ্ঠতা, ত্যাগ ও জিহাদের ফলে তা এক সময় এর চারপাশে বিরাজমান সকলের নেতৃত্বের উপযোগী হিসেবে বিকশিত হবে। তখনই দীনের কল্যাণে যেকোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হতে কোনো জটিলতা থাকবে না। আগুনের ওপর দিয়ে চলতে কোনো সমস্যা হবে না এবং জ্বলন্ত চুল্লিতে ঝাঁপ দিতেও কোনো বাধা থাকবে না। ইসলামি আন্দোলনের অধিকাংশ সন্তানই আল্লাহর পথে নিজেদের উৎসর্গ করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে তারাই লড়াইয়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং শাহাদাত বরণ করবে। আফগানিস্তানে এখন ইসলামি আন্দোলনের শতকরা নব্বই ভাগ কর্মী যুদ্ধে শহীদ হচ্ছেন। শতকরা নব্বই ভাগ।

একবছর আগে হেকমতিয়ার আমাকে বলেছিলেন, 'আমি জিহাদের শুরুতে সাতানব্বই জন কমান্ডার যুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম। এখন মাত্র আট জন জীবিত আছেন; বাকি উননব্বই জন শহীদ হয়েছেন।' শতকরা দশ জনমাত্র কর্মী জীবিত আছেন। তাঁরা বেঁচে আছেন মানুষের ভালোবাসায় ও শ্রদ্ধায়। তাঁরা প্রত্যেকে এই কামনা করেন যে, তিনি যদি তাঁর আত্মাকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতে পারতেন। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ইসলামি আন্দোলনের বাণী সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরাই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারাই

মুসলিম উম্মাহর শক্তিকে বিকশিত করছে। তারাই ইসলামি কাফেলাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলছে। আল্লাহপাক যাঁদের জীবিত রেখেছেন, জিহাদের অর্জনকে রক্ষা করার জন্যেই জীবিত রেখেছেন। ইসলামি দাওয়াত ব্যতীত মুসলিম যুবকদের অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হবে না এবং তারা জীবন-জীবিকার ভয় এবং দুনিয়া ও মানুষের ভয় থেকে মুক্ত হবে না। কেউ যদি প্রশিক্ষণ ছাড়াই অস্ত্র ধারণ করে এবং যুদ্ধ করতে চায় তাহলে সে অপরাধ ঘটাবে এবং নিজে ধ্বংস হবে। ইসলামি দাওয়াতও এরকম। দীর্ঘ সময় তা চলবে, সে-সময় কোনো জিহাদ থাকবে না। ইসলামি আন্দোলনের জন্যে শহীদ হওয়ার বিষয়টিও তাই। শহীদ হতে হবে চূড়ান্ত সময়ে। ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি দাওয়াত পরস্পর সম্পর্কিত এবং সম্পূরক। সুতরাং ইসলামি দাওয়াতের কোনো বিকল্প নেই। দীর্ঘসময়ব্যাপী তরবিয়তেরও (প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা) কোনো বিকল্প নেই। এবং সবশেষে জিহাদেরও কোনো বিকল্প নেই।

আমি এই সিদ্ধান্ত জানাতে চাই যে, পৃথিবীর যেকোনো ইসলামি আন্দোলনের পক্ষে পৃথিবীর যেকোনো ভূখণ্ডে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, যদি মানুষের সম্মতি ও সহায়তা তাদের সঙ্গে না থাকে। কেননা এই যুদ্ধ দীর্ঘ এবং প্রয়োজন অনেক। ইসলামি দাওয়াতের কর্মীসংখ্যা কম। তারা দীর্ঘসময়ব্যাপী বিশাল যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। আমার কথা এটাই। আমার এই মিশনের কথা হচ্ছে, মুসলিম যুবকদেরকে কুরআন-সুন্নাহ, তাওহিদ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও জিহাদের ভালোবাসার ওপর গড়ে তুলতে হবে। রিপুকে দমন করা, কুপ্রবৃত্তির ওপর জয়ী হওয়া, নিজের পছন্দের ব্যক্তিত্ব ও নিজ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা থেকে দূরে থাকা এবং যেখানে যেটা সত্য সেখানে সেটা উচ্চারণ করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তরবিয়ত দিতে হবে। মুখ ও গোপনাঙ্গের কুপ্রবৃত্তি, বিশেষ করে মুখের কুপ্রবৃত্তি—যখন যা মুখে আসে তা-ই বলে ফেলা এবং যখন যা সামনে আসে তা-ই খেয়ে ফেলা—থেকে মুক্ত থাকার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন [সাহল বিন সা'দ রা. থেকে বর্ণিত]—

ومن يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة

'কেউ যদি আমার পক্ষ থেকে তার মুখ ও লজ্জাস্থানের যিম্মাদার হয় (হেফাযত করে), আমি তার পক্ষ থেকে জান্নাতের যিম্মাদার হবো।'[৩৭]

---

[৩৭] সহিহুল বুখারি : হাদিস ৬৪৭৪।

আমরা যখন যুবকদেরকে এইসব বিষয়ের তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দেবো, তারা মানুষের মান-সম্মান-সম্ভ্রম, তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদের রক্তের ব্যাপারে নিরাপদ ও বিশ্বস্ত থাকবে। জিহাদ হচ্ছে অস্ত্র বহন করা এবং যুদ্ধ করা। আপনি যখন অস্ত্র বহন করবেন এবং আপনার ইসলামি তরবিয়ত না থাকবে, মনের ও দেহের প্রশিক্ষণ না থাকবে, আপনি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যেতে পারেন। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাদ দিয়ে আপনি মানুষের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়াবেন। আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষ এবং ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের একটি বড়ো অংশের মধ্যে আমি এই প্রবণতা দেখেছি। আর যেসব মূর্খ ও পাপী অস্ত্র ধারণ করে তারা মানুষের যন্ত্রণা, দুর্দশা ও ফেতনাই বৃদ্ধি করে। তাছাড়া ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা হবে দেশের নিরপত্তার প্রহরী। তারা নারীদের সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করবে, মানুষের জান-মালের হেফাযত করবে এবং তাদের দীনের হেফাযত করবে। বিষয় এই যে, আপনি যখন অস্ত্র বহন করবেন এবং চারপাশে হাজারো সশস্ত্র লোক থাকবে, আপনার মনে হবে এই এলাকায় আর কেউ নেই আমরাই সব। কখনো কেউ যদি বলে, তোমরা অমুক মেয়েটিকে আমার জন্যে পরিবেশন করো, স্বামী থেকে এই নারীর বিচ্ছেদ ঘটাও এবং আমার সামনে নিয়ে আসো বা অমুককে ডাকো এবং তাকে টাকা পরিশোধ করতে বলো তাহলে তা হবে রুশ বাহিনীর বর্বরতার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও নির্মম। এখানে যদি কোনো অভ্যন্তরীণ বাধা না থাকে যা আপনাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তাহলে আপনি হয়ে উঠবেন রুশ সৈনিকের চেয়েও পাষণ্ড ও নিষ্ঠুর । তাই আমি বলতে চাই, এই দাওয়াত ও তরবিয়তের মিশন নিয়েই আমি বের হয়েছি।

ইসলামি দাওয়াত আর তরবিয়তের ফলেই আফগানিস্তানে মুজাহিদরা বিজয়ী হয়েছেন। ইসলামি আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে দাউদের অভ্যুত্থান ঘটেছিলো। তারপর তারাকি এসেছে, হাফিজুল্লাহ আমিন এসেছে এবং তারপর রুশ বাহিনী এসেছে ইসলামি আন্দোলকে শেষ করে দেয়ার জন্যেই, কিন্তু তারা পারে নি। রুশ বাহিনী পরাজিত হয়েছে। এখন মুজাহিদরা একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে। বড়ো মহান সে রাষ্ট্র। কবি বলেন—

والطعن عند محبيهن كالعسل　أغلى الممالك ما يبنى على الأسل

'মহান সে-রাষ্ট্র যা বর্শার ফলার ওপর প্রতিষ্ঠিত, মহান রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট অপবাদ হলো মধুর মতো।'

আমরা যদি কাবুল থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ইসলামি আন্দোলনকে প্রসারিত করতে চাই তাহলে এটাই পথ : ইসলামি দাওয়াত; যুবকদেরকে

ইসলামের ওপর তরবিয়ত করা। তাঁরা বিশ্বাস, ধৈর্য ও শুদ্ধচিন্তা নিয়ে অস্ত্র ধারণ করবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করবে। তখনই তারা বিজয়ী হবে। এটা ছাড়া আমাদের সব প্রচেষ্টার ফল হবে পানিতে চারা রোপণ করা আর বাতাসে বীজ বপন করার মতো। কোনো লাভ নেই। ব্যর্থতার ওপর ব্যর্থতা জমা হয়ে ব্যর্থতার পাহাড় হয়ে উঠবে। আমাদের এই আন্দোলন ঘোষণা-স্লোগান, বাক্য অপচয় আর প্রচার-প্রসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। তা কোনো পরিণতিতে পৌঁছুতে পারবে না।

আমার জাতি আমাকে ত্যাগ করে নি এবং নিজেদের ভর্ৎসনাও করে নি

আমরা ফিলিস্তিনে ফিরে যাবো। আমরা এখন, শুধু এখন নয়, আফগানিস্তানে প্রবেশের পর থেকেই আমরা ফিলিস্তিনের কথা চিন্তা করেছি। আমার ইচ্ছা ছিলো, উপমহাসাগরীয় অঞ্চলে—সৌদি আরব ও কুয়েতে যেসব ফিলিস্তিনি যুবক কাজ করে তাদেরকে ধরে এখানে নিয়ে আসি। এখানে তারা জিহাদ দেখুক, যুদ্ধ দেখুক। তারা জিহাদের তরবিয়ত গ্রহণ করুক, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিক। তারা ভয়ের আগল ভেঙ্গে ফেলুক এবং যুদ্ধক্ষেত্রের শিক্ষা গ্রহণ করুক। তারা হবে ফিলিস্তিনের রক্ষিত সম্পদ। যখন ফিলিস্তিনের জন্যে ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ দিন আসবে, তারা ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। কিন্তু হায় আফসোস! আমার জাতি আমাকে ত্যাগ করে নি বটে, তবে আমার কথা না শোনার জন্যে নিজেদের ভর্ৎসনাও করে নি। বরং আমি জিহাদে এসেছি বলে আমাকেই ভর্ৎসনা করেছে। তারা নিজেদেরকে এই বলে সন্তুষ্ট রাখছে যে, তারা ফিলিস্তিনের জন্যেই কাজ করছে। যেসব যুবক এখানে আফগানিস্তানে এসেছে আমি তাদেরকে ফিলিস্তিনের সম্পদ ভেবেছি। বাস্তবিকপক্ষে তাদের হাতেই ফিলিস্তিনের মুক্তির সূচনা হতে পারতো। তা ছিলো একটা সুযোগ, কিন্তু সে-সুযোগ আর নেই। চুক্তির বাজারে তা শেষ হয়ে গেছে। তাতে যা লাভ হওয়ার হয়েছে এবং যা ক্ষতি হওয়ার তাও হয়েছে। ইহুদিরা যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো, তারা কোনো সুযোগ ব্যবহার করে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নি। তারা কখনো গোলকধাঁধায় চক্কর খায় নি এবং বিভ্রান্তিতে পড়ে হোঁচট খায় নি। তারা যা করেছে বাস্তবের নিরিখেই করেছে। কার্যত সেটাই যুক্তিযুক্ত ছিলো। তারা প্রস্তুতি নিয়েছে, অপেক্ষা করেছে, ধৈর্য ধরেছে এবং ক্লান্তিবোধ করেছে।

যাঁরা মনে করেন পশ্চিমারা ইহুদিদের জন্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে তাঁরা কল্পনার আকাশে আছেন। এটা তাঁদের ভ্রান্তি। আসলে ইহুদিরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছে এবং ধীরে ধীরে তাদের গন্তব্যের দিকে এগিয়েছে। ফিলিস্তি

নের ভূমিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো— আমেরিকা ও রাশিয়া তাদেরকে কেবল সহায়তা করেছে। তারা সশস্ত্র গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং নিহতও হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা লাভের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তারা ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে তারা বের হয়ে আসে। [যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ সালে।] এরপর তারা নতুন সংকল্প, শক্তি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আবির্ভূত হয়। দুইতিন বছর পর তারা এই শক্তি ও অভিজ্ঞতাকে ফিলিস্তিনি জাতির বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। খাটের ওপর যেমন সাঁতার কাটা যায় না, তেমনি শুধু কাগজ-কলম দিয়ে জিহাদ করা যায় না। যে খাটের ওপর সাঁতার শিখেছে, তারপর বন্ধুদেরকে দেখাতে নিয়ে গেছে কীভাবে সে সাঁতার শিখেছে, এটা বই সঙ্গে নিয়ে হাত-পা ছোঁড়ার বিষয়টি বইয়ের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়ার মতোই; সে সাগরে নামবে আর ফিরে আসবে না।

১৯৪৭ সালে ইহুদিরা যখন ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে তখন তাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৭৫ হাজার। ফিলিস্তিন এবং যেসব আরব দেশ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের সব সৈন্য মিলিয়েও ৭৫ হাজার ছিলো না। তারা এই ৭৫ হাজার সৈন্যকে আরো সংহত করেছে, আধুনিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ করেছে ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং নতুন সৈন্য যোগ করেছে। গত তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা তাদের ভিত্তি সংহত করে যাচ্ছে। সুতরাং এটা বলা যাবে না যে, তারা সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের ফল। তারা নিজেরাই নিজেদের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং তা সংহত করেছে। পঞ্চাশ বছর তারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছে, সম্পদ ব্যয় করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে, তারপর সফল হয়েছে। বাতিল যখন শক্তি অর্জন করে এবং সহয়তা পায়, বিজয় লাভ করে। সত্য যখন তার সৈনিকদের হারিয়ে ফেলে, পরাজিত হয়। তবে হ্যাঁ, তখন অনেক অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিলো যেগুলো ইহুদিদেরকে তাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে আপনি যদি বিশ্বষড়যন্ত্রের কথা বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত; আপনি যদি ফিলিস্তিনি জাতির ধোঁকাবাজির কথা বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত; আরব রাষ্ট্রগুলোর দায়সারা ভাব এবং ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে তাদের প্রতারণার কথা যদি আপনি বলেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত। এই পরিস্থিতিগুলো ইহুদিদেরকে তাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে। তবে একথা বলতেই হবে, এসবের তুলনায় প্রশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। তারা মানেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের পিতৃপুরুষের ভিটায় প্রত্যাবর্তনের জন্যে যুদ্ধ করছে।

কতিপয় নষ্ট ভিখিরি বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন যে সম্মানিত ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। আমরা কেবল জায়নিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করবো। অর্থাৎ কোনো ইহুদিকে বুলেট ছোঁড়ার আগে আমরা তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নেবো যে তার রক্তে কতো ভাগ জায়নবাদ (Zionism) আছে। যদি তার রক্তে ৫৫ ভাগ জায়নবাদ থাকে তবে তাকে হত্যা করবো, কেননা সে জায়নিস্ট; আর যদি ৪৫ ভাগ থাকে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না, কেননা সে সম্মানিত ইহুদি। আসলে ইহুদি ও জায়নবাদী (صهيوني /Zionist)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? হায় আফসোস! হে দার্শনিকেরা, তোমরা যদি আমাদের জানিয়ে দিতে কীভাবে আমরা ইহুদি ও জায়নিস্টদের মাঝে পার্থক্য করবো! তাঁরা বলেন, صهيونية / Zionism হচ্ছে আদি ইহুদিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ যারা আদি ইহুদিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তারা صهيوني / Zionist আর বাকিরা সম্মানিত ইহুদি (يهودي شريف)। জায়নিজম যে আদি ইহুদিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তন, Chaim Weizmann[38]-ও এমনটি বলেছেন। একই কথা বলেছেন Theodore Herzl[39]-ও । তিনি ১৮৯৭ সালে জায়নবাদ (صهيونية / Zionism) প্রবর্তন করেন।

কিন্তু কীভাবে তা হবে? আমরা তো দেখতে পাই সবাই আদি ইহুদিবাদের দিকে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী। তারা মার্কিন হওয়া সত্ত্বেও ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, নিউমেক্সিকো, টেক্সাস ও ভিলার আবাসস্থল ত্যাগ করে কেন

---

[৩৮] Chaim Azriel Weizmann ২৭ শে নভেম্বর ১৮৭৪ সালে বেলারুশের পিন্স্ক এলাকার নিকটে মোটাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জায়নিস্ট অরগানাইজেশন-এর সভাপতি ও ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৫২ সালের ৯ই নভেম্বর মৃত্যু পর্যন্ত একই পদে বহাল থাকেন। তিনি রসায়নবিদ ছিলেন এবং আইনস্টাইনের সঙ্গে মিলে গবেষণা করেন। তাঁর রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann.*

[৩৯] ১৮৬০ সালে ২রা মে হাঙ্গেরির পেস্টে এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম বেনজামিন জি'ইভ হার্জেল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন। লেখক, সাংবাদিক, নাট্যকার ও রাজনৈতিক কর্মী। আধুনিক রাজনৈতিক ইহুদিবাদের জনক হিসেবে পরিচিত। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠায় ইহুদিবাদ প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাঁর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ : The Jews' State এবং The Old New Land । তিনি পনেরোটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। ৩রা জুলাই ১৯০৪ সালে ৪৪ বছর বয়সে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির ইডলাকে তাঁর মৃত মৃত্যু হয়। ১৯৪৯ পর্যন্ত তাঁর কবর ছিলো ভিয়েনার ডাবলিঙ্গার ফ্রেডহোফ-এ। ইসরাইলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তাঁর দেহ উঠিয়ে এনে জেরুজালেমে সমাধিস্থ করা হয়। আভনার ফক রচিত হার্জেলের জীবনীগ্রন্থ Herzl, King of the Jews: A Psychoanalytic Biography of Theodor Herzl ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

জেরুজালেমে এসেছে। তারা এখানে কি এসেছে কেবল একারণে যে তারা জায়নিস্ট? তারা কি ফিলিস্তিনের ভূমিতে রক্ত, বুলেট আর বারুদের ভেতর বাস করছে একারণে যে তারা কেবল জায়নিস্ট? না-কি তারা সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে বসে দাউদ আ.-এর বংশধরের কোনো সন্তান পৃথিবী শাসন করবে? Moshe Dayan যখন ১৯৬৭ সালে মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করেছিলেন, তিনি কী বলেছিলেন? Dayan বলেছিলেন, 'জেরুজালেম থেকে ইয়াসরিব পর্যন্ত যে-রাজ্য শাসন করা হয়েছিলো আমি এখানে দাঁড়িয়ে তার ঘ্রাণ পাচ্ছি।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমি খায়বার থেকে আমার পিতৃপুরুষদের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' David Ben-Guerin যখন ১৯৬৭ সালে পশ্চিমতীরে প্রবেশ করেন আমি তাদের বলতে শুনেছি—পশ্চিমতীর দখলের সময় আমি সেখানে ছিলাম—ইসরাইলি সৈনিকরা মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে এবং বলতে থাকে, 'মারা গেছে..., হ্যাঁ মারা গেছে..., মুহাম্মদ মারা গেছে আর কিছু অবলা তার উত্তরসূরি হয়েছে।' ইসরাইলি রেডিওতে আমি তাদের বলতে শুনেছি, ডেভিড বেন গুয়েরিন ঘোষণা করেন, 'ফিলিস্তিনে প্রবেশের পরে আজকের দিনটি আমাদের কাছে সবচেয়ে মহিমাময়। পবিত্র রাজধানীর দুই প্রান্ত আজ একত্র হয়েছে। জেরুজালেম ব্যতীত ইসরাইলের কোনো অর্থ থাকতে পারে না। আর আদি ইহুদি রাজ্য ব্যতীত জেরুজালেমের কোনো অর্থ থাকতে পারে না।' ডেভিড বেন গুয়েরিন এভাবেই বলেছিলেন। আরেকবার তিনি টেলিভিশনে পশ্চিমতীর এবং সেখান থেকে তাদের ফিরে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করার সময় মুসলিম নেতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। আপনাদের যেমন হাসানুল বান্না[৪০] রয়েছেন এবং তিনি সাইয়্যিদ কুতুবকে

---

[৪০] পুরো নাম হাসান বিন আহমদ বিন আবদুর রহমান আল-বান্না। আরব ও ইসলামি বিশ্বের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা। মিসরের কুফরুশ শায়খ জেলার ফুহ এলাকায় ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই পরিবারের সঙ্গে বুহায়রা জেলার মাহমুদিয়া এলাকায় চলে যান। মাদরাতুর রাশাদ আদ-দীনিয়্যাতে অষ্টম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এ-সময় তিনি শায়খ মুহাম্মদ যাহরানের চিন্তাধারায় দারুণ প্রভাবিত হন। একই সময়ে তিনি স্থানীয় কয়েকটি সংস্কারপন্থী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২০ সালে দামনাহুরের মাদরাসাতুল মুআল্লিমিনে ভর্তি হন। এখানে তিনি সুফিবাদী দর্শনে বুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে কায়রোর দারুল উলুম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯২৭ সালে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। কায়রো থেকেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি ও জনসম্মুখে ভাষণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চমৎকার প্রকাশভঙ্গির ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনটিকে দাঁড় করিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। হাসানুল বান্না তৎকালীন রাজা ফারুকের রোষানলে পড়েন এবং ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি আততায়ীদের গুলিতে নিহত হন। 'রিসালাতু হাসান আল-

দীক্ষা দিয়েছেন তেমনি আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন আমাদের আত্মিক পিতা Jabinski (الأب الروحي جابينسكي)। পশ্চিমতীর থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা তাওরাতকে অস্বীকার করার নামান্তর মনে করি।'

আসলে বিষয়টি হচ্ছে বিশ্বাস ও আকিদার। সিনাই যুদ্ধে ইসরাইলের যেসব ট্যাঙ্ক অংশগ্রহণ করে সেগুলোর ওপর তাওরাতের বাণী লেখা ছিলো। আর মিশরের পক্ষে যেসব ট্যাঙ্ক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেগুলোর গায়ে লেখা ছিলো ناصرنا عبدالناصر 'আবদুন নাসের আমাদের সাহায্যকারী'। এই ব্যাপারগুলো বিশ্বাস ও আকিদার জায়গা থেকে হয়েছে। Moshe Dayan-এর কন্যা Yaël Dayan তাঁর Israel Journal : June 1967[৪১] লিখেছেন, 'যখন যুদ্ধের দক্ষিণ ফ্রন্ট—মিসরীয় ফ্রন্ট—থেকে আমাদের কাছে শত্রুর তীব্র আক্রমণের খবর এলো যে, আমাদের সৈনিকরা শত্রুর ভয়ে কম্পিত, তার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের কাছে রাব্বি এলেন (ইহুদিদের ধর্মগুরুকে ইংরেজিতে বলে Rabbi, আরবিতে বলে حاخام) এবং তাওরাতের কিছু অংশ পাঠ করে শুনালেন। তওরাতের পাঠ শুনে আমাদের শঙ্কা শান্তিতে এবং ভয় প্রশান্তিতে পরিণত হলো।' ১৯৬৭ সালে মোশে দায়ান ও ডেভিড বেন গুয়েরিন যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তখন রাব্বি তাঁদের সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন। (এতে তাদের বিশ্বাস ও আকিদার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।)

সুলতান আবদুল হামিদের সাহসিকতা

ফিলিস্তিন কীভাবে হাতছাড়া হলো সে-কাহিনি অনেক লম্বা। তবে এখানে সুলতান আবদুল হামিদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা না করা আমাদের উচিত হবে না। আমাদের চিন্তা-ভাবনায় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক আসনে রয়েছেন। একদিন দুনিয়াকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। ইহুদিরা তাঁর ব্যক্তিগত পকেটে ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড দিতে চেয়েছিলো। তারা আরো প্রস্তাব দিয়েছিলো, উসমানি সাম্রাজ্যের জন্যে নৌবহর গঠন করবে, জেরুজালেমে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। তারা প্রস্তাব দিয়েছিলো, এসবের বিনিময়ে তাঁকে পশ্চিমে রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এসবের সঙ্গে তারা আরো প্রস্তাব দিয়েছিলো,

---

বান্না' নামে তাঁর রচনাবলি প্রকাশিত হয়েছে। ইখওয়ানুল মুসলিমিন মিসরের রাজনীতিতে সাত দশক ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং বর্তমানে স্বৈরাচারী হুসনি মুবারকের পতন ঘটিয়ে সরকার গঠন করে । ২০১৩ সালের ৩ জুলাই সিসির অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ মুরসির সরকারের পতন ঘটে।

[৪১] Israel Journal: June 1967 (also known as A Soldier's Diary) - 1967

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সমস্ত ঋণ তারা শোধ করে দেবে। কিন্তু সুলতান আবদুল হামিদ থিয়োডর হার্জেল-এর এইসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশেষে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা ড. থিয়োডর হার্জেল-কে বলে দাও, তিনি যেনো এ-পথে আর একটি পদক্ষেপও না করেন। আমার জাতি রক্তের বিনিময়ে ফিলিস্তিনের দেখা পেয়েছে। রক্ত ছাড়া সেটা তাদের থেকে কিছুতেই নিয়ে নেয়া যাবে না। ফিলিস্তিনকে আমার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেয়ে আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়াটা আমার জন্যে সহজ হবে। আমরা জীবিত থাকতে আমাদের দেহকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবো না।' এরপর তিনি বলেন, 'হে থিয়োডর হার্জেল, তোমার টাকা যথেষ্ট আছে। আবদুল হামিদ চলে যাওয়ার পর তোমারা মাগনাই ফিলিস্তিন পেয়ে যাবে।'

আমরা যখন ছোটো ছিলাম আমাদেরকে পড়ানো হয়েছে, আবদুল হামিদ ছিলেন একনায়ক (শক্তিবলে এবং অবৈধ উপায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক)। আমারা তাঁর ক্ষেত্রে একনায়কত্বের দৃষ্টান্ত পেশ করতাম। যখন আমাদের কেউ আরেকজনকে গালি দিতে চাইতো, বলতো, তুই হামিদি। মানে, তুই কিছুই বুঝিস না। আমাদের আরব সাংবাদিকেরা আবদুল হামিদের উপাধি দিয়েছেন 'রক্তনিমজ্জিত'। তাঁরা পত্রিকাতে লেখেন, লাল একনায়ক। তাঁরা কখনো আবদুল হামিদের সঙ্গে 'সুলতান' বিশেষণ প্রয়োগ করেন না।[৪২]

মুসলমানেরা এবং ফ্রিম্যাসন গুপ্তসঙ্ঘের কর্মীরা একত্র হয়। সুলতান আবদুল হামিদের সঙ্গে তাদের এই বিরোধের পর ইমানুয়েল কারাসু (Emmanuel Carasso বা Emanuel Karasu)[৪৩] এবং Herzl ইতালি যান। ইতালি আবদুল হামিদের কাছে একটি তারবার্তা পাঠায়। তাতে তারা এই হুমকি দেয়, 'আপনাকে নিজের প্রাণ ও সিংহাসন দিয়ে এই বিরোধের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।' সুলতান আবদুল হামিদ জানতেন, তিনি বিশ্বইহুদি, তাদের সম্পদ, ক্ষমতা ও তাদের প্রতিনিয়ত উস্কানির মোকাবেলা করছেন। তুরস্কের স্যালোনিকা ও অন্যান্য এলাকায় ফ্রিম্যাসন গুপ্তসঙ্ঘের ষড়যন্ত্র-বৈঠক শুরু হয়। তারা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের ক্রয় করে এবং এসব বৈঠকে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। ১৯০৯ সালে তারা মাহমুদ শওকত পাশাকে

---

[৪২] সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ স্বাধীনচেতা হলেও সত্যবাদী আলেমদের রেহাই দেন নি। বিখ্যাত আলেম শাখয় ইবরাহিমসহ তিনি বহু হক্কানি আলেমকে হত্যা করেন। তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী মানুষের জন্যে তিনি পাহাড়ের পাদদেশে নির্জন কারাগার নির্মাণ করেছিলেন। কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিতে রেখে ক্ষুধায়-নির্যাতনে মানুষকে হত্যা করতেন। হিংস্রতা ও রক্তপাতের জন্যে তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইনি শ্মশ্রুমুণ্ডিত ছিলেন। ১৮৭৬ সালে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ১৯০৯ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। তাঁর জন্ম ১৮৪২ সালে এবং মৃত্যু ১৯১৮ সালে।

[৪৩] একজন ইহুদি আইনজীবী।

স্যালোনিকা দুর্গের কমান্ডার নিযুক্ত করে। মাহমুদ শওকত পাষা কনস্ট্যান্টিনোপল ঘিরে ধরেন এবং অভ্যুত্থান ঘটনা। সুলতান আবদুল হামিদ পদত্যাগের চুক্তিতে সম্মত হন। শাসনক্ষমতা থেকে পদত্যাগের চুক্তিপত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তিনজন : কমিটি অব ইউনিয়ন এ্যান্ড প্রগ্রেস-এর সদস্য আরসাতাদা পাশা, ইহুদি আইনজীবী ইমানুয়েল কারাসু এবং সুলতানের ব্যক্তিগত সহকারী আরিফ হেকমত।

কাবুল থেকে জেরুজালেম : দুই : দুটি ঘটনা

২৭ শে এপ্রিল, ১৯০৯। এই রাতের দুইটি বড়ো ঘটনার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। সুলতান আবদুল হামিদের শাসনক্ষমতা থেকে পদত্যাগের অর্থ হচ্ছে ইহুদিদের হাতে ফিলিস্তিনের পতন এবং ইসলামের চিহ্ন ও অস্তিত্ব মুছে যাওয়া। তারপর আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমরা তুরস্কের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিই এবং তুরস্ককে পরাজিত করি। তারপর উসমানিয়া সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় এবং মিত্রদের মাঝে তা বণ্টিত হয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কী ঘটে? শরিফ হোসাইনকে সমগ্র আরবের রাজত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। আরব অভ্যুত্থানের নেতা এবং ইংরেজ লেখক টমাস লরেন্স[৪৪] তাঁর Seven Pillars of Wisdom : A Triumph গ্রন্থে লেখেন, 'আমি গর্ববোধ করি যে, আমি তিরিশটি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম সেখানে ইংরেজদের রক্ত ঝরে নি। আমাদের শাসনের অধীনে যেসব জাতি রয়েছে তাদের সকলের রক্তের চেয়ে একজন ইংরেজের রক্ত আমাদের কাছে বেশি প্রিয়। আরব অভ্যুত্থানে আমাদের কেবল ১০ মিলিয়ন দিনারই ব্যয় হয়েছে।'

[১৯১৬-১৯১৭ সালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। ইংরেজদের মদদে শরিফ হোসাইন বিন আলি ও তাঁর পুত্র ফয়সাল এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। শরিফ হোসাইনকে সমগ্র আরবের রাজত্ব প্রদান করা হবে বলে ইংরেজরা তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু অভ্যুত্থান সফল

---

[৪৪] পুরো নাম টমাস এ্যাডওয়ার্ড লরেন্স। ডাকনাম লরেন্স অব আরব। ১৮৮৮ সালের ১৬ই আগস্ট যুক্তরাজ্যের কার্নারফনশায়ারের ট্রেমাডগ এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ আর্মি ব্রিটিশ এয়ারফোর্সে অফিসার ছিলেন। উসমানিয়া সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও তিনি উল্লেখযোগ্য নয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যার অধিকাংশই ঘটেছে আরব দেশগুলোতে। ১৯৩৫ সালের ১৯ শে মে ইনল্যান্ডের বোভিংটন ক্যাম্পে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো Revolt in the Desert.

হওয়ার পর ইংরেজরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং শরিফ হোসাইনকে কারাগারে অন্তরীণ করে। ইংরেজ সামরিক কর্মকর্তা ও লেখক টমাস লরেন্স শরিফ হোসাইনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন এবং তুর্কিদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত করেন। এই লরেন্সকে 'আরব লরেন্স'ও বলা হয়। Seven Pillars of Wisdom : A Triumph তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি আরবিতে أعمدة الحكم السبعة নামে অনুদিত হয়েছে।]

এই অভ্যুত্থানের পর ইহুদিদের জন্যে আবার সব পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ১৯১৭ সালের ২রা অক্টোবর [২রা নভেম্বর] ফিলিস্তিনে ইহুদি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেলফোর ডিক্লারেশনের[৪৫] প্রকাশ ঘটে। বেলফোর ডিক্লারেশন প্রকাশের দুই সপ্তাহ আগে লেনিন[৪৬] ইহুদিদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাদেরকে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গড়ে দেবেন। ১৯১৭ সালে ৬-৭ই অক্টোবর রুশ বিপ্লব [বলশেভিক বিপ্লব/ অক্টোবর বিপ্লব/ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব][৪৭] সংঘটিত হয়। এই অভ্যুত্থানের এক

---

[৪৫] এটি মূলত ২রা নভেম্বর ১৯১৭ সালে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোর কর্তৃক ব্রিটিশ ইহুদি কমিউনিটির নেতা ব্যারন রোথস্কিল্ড-এর কাছে প্রেরিত একটি চিঠি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ফিলিস্তনে ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্যে মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

[৪৬] রুশদেশে ১৯১৭ সালে সংঘটিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান নেতা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭০ সালে সিম্‌বিস্কি অঞ্চলে তাঁর জন্ম। আসল নাম ভ্লাদিমির ইলিচ্ উলিয়ানভ্। লেনিন (Lenin) তাঁর ছদ্মনাম।

কিশোর বয়স থেকেই লেনিন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করেন। রুশ সম্রাট বা জারকে হত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো তার বড়ো ভাইয়ের। এই ঘটনাই তাঁকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৯১ সালে তিনি আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯০০ সালে দেশের বাইরে থাকার সময় তিনি 'ইস্ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) নামে একটি বিপ্লবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৩ সালে তৎকালীন রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে জার বিরোধী অভ্যুত্থানে জারের পতন না ঘটলেও ১৯১৭ সালের অভ্যুত্থানে জারের পতন ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ৯ই নভেম্বর থেকে ১৯২৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারপ্রধান ছিলেন।

কার্ল্ মার্ক্স এবং ফ্রেড়রিশ এঙ্গেল্স্-এর চিন্তার সম্প্রসারণ ও ব্যাখ্যার জন্যে তিনি বিখ্যাত। তাঁর এই চিন্তাই লেনিনবাদ নামে পরিচিত। ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

[৪৭] ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ার পেত্রোগ্রাৎ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ায় অনুসৃত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটি ছিলো ২৫ শে অক্টোবর। তাই একে অক্টোবর বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলো লেনিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু বল্‌শেভিক অংশ। এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণি ও

সপ্তাহ পর লেনিন ইহুদিদের পক্ষে দুই দফাবিশিষ্ট একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন :

১. ইহুদিদের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা অপরাধ। এই অপরাধের ক্ষেত্রে আইনানুগ দণ্ডের বিধান রাখা হবে।
২. আমরা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্যে একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিচ্ছি।

লেনিনের এই ঘোষণার তিন সপ্তাহ পর ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে ইংরেজরা বেলফোর ডিক্লারেশন ঘোষণা করে। ১৯২২ সালে আমেরিকা এই ডিক্লারেশনের স্বীকৃতি দেয়। সেই যে তারা শুরু করে, ১৯৪৭ সালে তা বাস্তবায়িত হয়।

টাকার বিনিময়ে ফিলিস্তিনের ভূমি বিক্রয়

ফিলিস্তিনের ভূমি বন্টনের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে নভেম্বর মাসের ২৯ তারিখে। ব্রিটেন ফিলিস্তিনে এজেন্ট নিয়োগ করেছিলো। তারা তাদেরকে নিজেদের ভূমি ত্যাগ করতে উৎসাহিত করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রিটেন তাদেরকে তাদের জন্যে নির্ধারিত ভূমি প্রদান করে। ১৯৪৮ সালে ১৫ই মে ব্রিটিশ এজেন্সির (ব্রিটিশ ম্যান্ডেট) মেয়াদ শেষ হয়। ইংরেজরা ইহুদিদেরকে বা আরবদেরকে তাদের চুক্তি অনুযায়ী ভূমি প্রদান করে। ১৯৪৮ সালে ১৫ই মে ব্রিটিশরা যখন ফিলিস্তিন থেকে বেরিয়ে আসে তখন ইহুদিদের ভূমির পরিমাণ ৩ মিলিয়ন একরের বেশি ছিলো না। ফিলিস্তিনের মোট ভূমির পরিমাণ ছিলো ২৭ মিলিয়ন একর। এই ভূমি তারা কীভাবে পেলো? সাধারণভাবে এই অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে যে, ফিলিস্তিনি জাতি তাদের ভূমি বিক্রি করে দিয়েছে। আমি আপনাদেরকে সংখ্যা উল্লেখ করে বলতে চাই ইহুদিরা কীভাবে এই ভূমির মালিক হলো। তুরস্কের খেলাফত ব্যবস্থার শেষের দিকে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এ্যান্ড প্রগ্রেস'-এর যেসব তুর্কি নেতা

সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে। বিপ্লবপরবর্তী সময়কাল ছিলো নানা দিক দিয়ে জটিল। যে-ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো তা দেশের ভেতর ও বাহির থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বে পরিণত হয়। অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে, রুদ্ধ হয়ে পড়ে চিন্তার স্বাধীন বিকাশ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে-প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলো নানা পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি ও জটিলতার কারণে নব্বইয়ের দশকে এসে তা একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে।

সুলতানকে অপসারিত করেছিলো, ইহুদিরা তাদের থেকে ঘুষ হিসেবে পেয়েছে ৬ লাখ ৫০ হাজার একর ভূমি। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের পক্ষ থেকে ইহুদি এজেন্সি (Jewish Agency) বিনা পয়সায় পেয়েছে ৩ লাখ একর ভূমি। বিটিশ সরকারের প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষ প্রতীকী মূল্যে জুইশ এজেন্সির কাছে বিক্রি করেছে ২ লাখ একর ভূমি। দুই খ্রিস্টান আর্চবিশপ ও তাদের পরিবার বিক্রি করেছে মার্‌জ ইবনে আমের এলাকার ৪ লাখ একর ভূমি। সুলতান আবদুল হামিদের পক্ষ থেকে উপঢৌকনের নামে ব্রিটেন ইহুদিদেরকে প্রদান করে হুলা ও বিসান অঞ্চলের ৬৫ হাজার একর ভূমি। তাইয়ান আল-বয়রুতির পরিবার ইহুদিদের কাছে বিক্রি করে আল-হাওয়ারেস উপত্যকার ৩২ হাজার একর ভূমি। সিরিয়া ও লেবাননের তাইয়ান আল-বয়রুতি, কুব্বানি, আল-জাযায়েরি পরিবার এবং খ্রিস্টান আর্চবিশপ পরিবার বিক্রি করে তুলেকারাম, জানিন ও বিসান অঞ্চলের ২৮ হাজার একর ভূমি। বিশ্বাসঘাতকতা করে ফিলিস্তিনের কিছু মুনাফিক ইহুদিদের কাছে বিক্রি করে ৩ লাখ একর ভূমি। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এরা মুজাহিদ ও বিদ্রোহীদের হাতে হত্যা ও জবাইয়ের শিকার হয়। ব্রিটিশরা ১৫ই মে ফিলিস্তিন থেকে বেরিয়ে আসার আগের দিনগুলোতে ইহুদি এজেন্সিকে দিয়ে দেয় ১ মিলিয়ন ৪ লাখ ২৫ হাজার একর ভূমি। সব মিলিয়ে ইহুদিরা সাড়ে ৩ মিলিয়ন একর ভূমির মালিক হয়।

এরপর ইংরেজ জেনারেল গ্লুব পাশার (Lieutenant-General Sir John Bagot Glubb) নেতৃত্বে সাতটি আরব রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তার ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ৯ মাস অবস্থান করে। হায়, এরা যদি ফিলিস্তিনে প্রবেশ না করতো? এই নয় মাসে ইহুদিরা কী নিয়েছে? আল-লুদ ও রামাল্লা থেকে নিয়েছে ৯ লাখ ৫০ হাজার একর ভূমি; পূর্বজালিলি ও পশ্চিমজালিলি থেকে নিয়েছে ২ মিলিয়ন একর ভূমি; আশ-শোনা, রুদাস ও মানাতিকে খলিল থেকে নিয়েছে ১ মিলিয়ন ৬ লাখ ৭৫ হাজার একর ভূমি; নাকাব মরুভূমি ও রণকৌশলগত এলাকা থেকে নিয়েছে ১২ মিলিয়ন ৭ লাখ একর ভূমি। আরব সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশের পর ইহুদিরা মোট দখল করে সাড়ে ১৭ মিলিয়ন একর ভূমি। আগের সাড়ে ৩ মিলিয়ন আর এই নয় মাসে দখলকৃত সাড়ে ১৭ মিলিয়ন—মোট ২১ মিলিয়ন একর ভূমি ইহুদিরা দখল করে। ফিলিস্তিনিদের জন্যে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ৬ মিলিয়ন একর ভূমি।

আরব সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা

ফিলিস্তিনিরা কী করেছে? ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধ করেছে। পরে আরব সেনারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তাদেরকে বলে, তোমরা প্রতিরোধ-লড়াই ত্যাগ করো। আমরাই তোমাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করবো। ফলে ফিলিস্তিনিরা ধোঁকা খেয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। আমি আমার বাবাকে একটি বন্দুকের গল্প বলতে শুনেছি। তিনি বন্দুকটি কেনার জন্যে জানিন থেকে উত্তর আলেপ্পোতে গিয়েছিলেন এবং একশো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বন্দুকটি কিনেছিলেন।

ফিলিস্তিনের মুসলমানেরা ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৮ বা ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রতিরোধ-লড়াই করেছে। তারপর আরব সেনাবাহিনী আল-লুদ ও রামাল্লায় প্রবেশ করে। আপনারা আল-লুদ ও রামাল্লায় ছয়মাসে যা ঘটেছিলো তার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন এবং গ্রহণ করুন। ফিলিস্তিনিরা সবসময় সেখানে সতর্ক পাহারায় থাকতো। নারীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহারায় থাকতো আর পুরুষরা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত পাহারায় থাকতো। কোনো ইহুদি আল-লুদ ও রামাল্লার ধারেকাছে যাওয়ারও সুযোগ পায় নি।

আল-লুদ ও রামাল্লা এলাকা দুটি লম্বায় ৪৮ কিলোমিটার। জেনারেল গ্লুব পাশার অনুগামী হয়ে ইংরেজ কমান্ডার মিস্টার ল্যাস-এর নেতৃত্বে জর্ডানের সেনাবাহিনীর একশো পঞ্চাশ জন সৈনিক আল-লুদ ও রামাল্লায় প্রবেশ করে এবং কমান্ডার ল্যাস তাদেরকে ৪৮ কিলোমিটারব্যাপী বণ্টন করে দেন। প্রত্যেক এক কিলোমিটারে থাকবে তিনজন সৈনিক আর তাদের সবার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকবেন দুইজন কর্মকর্তা। শেষে একদিন অস্ত্রবিরতি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপর পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর চাপ প্রয়োগের ফলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদল ফিলিস্তিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার একমাস পর ১৯৪৮ সালের জুন মাসে এই চুক্তি ফিলিস্তিনি জাতির ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তারপর কী ঘটে? ইহুদিরা চেকোস্লোভাকিয়া থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে এবং রাশিয়াসহ অন্যান্য দেশে যেসব ইহুদি ছিলো তাদেরকে নিয়ে আসে। তারা নিজেদের সঙ্গে অন্যদের শক্তির সমতা নিরূপণের চেষ্টা করে। অবশেষে একদিন—চুক্তির সময়সীমার ভেতরেই—ইহুদিরা আল-লুদ ও রামাল্লায় হামলা করে বসে। মাত্র দুই ঘণ্টায় তারা রামাল্লা ও আল-লুদ দখল করে নেয়। হ্যাঁ, মাত্র দুই ঘণ্টায়! আরব সৈনিকরা ফিলিস্তিনে প্রবেশের সময় এই ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো যে, কেউ যদি অস্ত্র বা গোলাবরুদ বহনকারী কোনো ফিলিস্তিনিকে পায় সে যেনো তাকে ধরে মার্শাল কোর্টে উপস্থিত করে। তাকে মার্শাল কোর্টে ফাঁসি দেয়া হবে। আরব যুবকেরা ক্রোধে জ্বলে ওঠে। মিশরের ইসলামি আন্দোলনের সত্তর জন যুবক একটি বিমানে ওঠে এবং ফিলিস্তিনে প্রবেশের জন্যে আম্মানে

আসে। জেনারেল গ্লুব পাশা বিমানটিকে আম্মান ত্যাগ করে সরাসরি কায়রোতে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়। যুবকদের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলা হয়। রাজা ফারুক[৪৮] তাদের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে।

ইসলামি আন্দোলনের কাল

তারা সিনাই পর্বত পর্যন্ত হেঁটে আসে এবং নাকাব মরুভূমিতে পৌঁছে। হাসানুল বান্না দেখলেন যে, ফিলিস্তিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আরব ভূখণ্ডে তখন ইখওয়ানুল মুসলিমিন ব্যতীত আর কোনো ইসলামি আন্দোলন নেই। আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আয্‌যাম পাশার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, হে আয্‌যাম, ফিলিস্তিন তো শেষ হয়ে গেছে। আরব সৈনিকেরা সেখানে লড়াই করতে প্রবেশ করে নি। আমরা লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত আছি। এখন আমরা কী করতে পারি? তারা ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে নীল নদের পাশে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন। আয্‌যাম পাশা, হাসানুল বান্না এবং উলুবা পাশার নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের অধীনে সেখানে কাজ চলতে থাকে। আয্‌যাম পাশা মিশরের একটি অংশে এবং সিরিয়ার একটি অংশে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে আলাদা ক্যাম্প স্থাপন করেন। ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা এই ক্যাম্পগুলোতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রথম দলটি কামেল আশ-শরিফ ও মুহাম্মদ ফারগালির নেতৃত্বে লিখিত নির্দেশনা নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তাঁরা প্রথমে নাকাব, রাফাহ, খানে ইউনুস ও গাজায় তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় দলটি আহমদ আবদুল আযিযের নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। আহমদ আবদুল আযিয ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কেউ ছিলেন না; তিনি সেনাবাহিনীর সাহসী কর্মকর্তা ছিলেন। তবে ইখওয়ানুল মুসলিমনের লাইয়ুদ পাশা, আবদুল মুনইম, আবদুর রউফ ও মারুফ আল-হাদারি তাঁকে সহায়তা

---

[৪৮] ইনি মিসরের সর্বশেষ রাজা প্রথম ফারুক। ১৯৩৬ সালে মাত্র ষোলো বছর বয়সে তাঁর পিতা রাজা প্রথম ফুয়াদের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯৩৭ সালের ২৯ জুলাই ফারুকের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাঁর চাচা আমির মুহাম্মদ আলি ভারপ্রাপ্ত রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফারুক প্রথমে জনপ্রিয় থাকলেও স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার পর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে এবং গণবিরোধিতা দেখা দেয়। ১৯৫২ সালে জেনারেল মুহাম্মদ নাজিবের নেতৃত্বে সেনা-অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফারুকের পতন ঘটে এবং এ-বছরের ১৬ই জুলাই তিনি ইউরোপে নির্বাসিত হন। ফারুক ১৯২০ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৫ সালে রোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে মিসরের ভূমিতে দাফন করার দাবি জানানো হলে সরকার তা মেনে নেয়। ফারুকের প্রথম স্ত্রী সাফিনাজ যুল ফাকার এবং দ্বিতীয় স্ত্রী নারিমান সাদেক। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে একমাত্র সন্তান আহমদ ফুয়াদ।

করেছেন। তাঁরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন এবং কুদ্স থেকে আল খলিল পর্যন্ত তাঁদের ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই দলটির হাতে ইহুদিরা এতো বেশি হত্যা ও বিপর্যয়ের শিকার হয় যা তারা কখনো চিন্তা করে নি। কিন্তু ইহুদিরা নিজেদেরকে দ্রুত সামলে নেয়। ইসলামি আন্দোলনের এক যুবক, হুসাইন হিযাজি দ্বিতীয় দলের একজন কমান্ডার ছিলেন। তিনি একাই একটি উপনিবেশ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সেখানে ইহুদিদের যে-কয়টি বাড়ি ছিলো তার সবগুলো তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইহুদিদের কী করার ছিলো? তারা কুদ্সকে নিজেদের কব্জায় রাখতে চেয়েছিলো। এজন্যেই তারা তাড়াহুড়ো করছিলো। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, আহমদ আবদুল আযিযের হাতে কুদ্সের পতন ঘটবে। তারা যে-উপনিবেশ স্থাপন করেছে সেগুলোরও পতন ঘটবে। বিশেষ করে সুয়ারে বাহের ও কুদ্সের চারপাশে তারা যে-উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো সেগুলোর পতন অবশ্যম্ভাবী। কাফেরদের প্রথম উপনিবেশ ছিলো দুদাম এবং যুদ্ধও সেখানেই চলছিলো। দাজাজ উপনিবেশের বাড়িগুলো মুজাহিদরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। অধিক পশুপাখি ও ফসলের কারণে তারা এই উপনিবেশের নাম দিয়েছিলো দাজাজ ও বাকার উপনিবেশ। দাজাজ মানে মুরগি আর বাকার মানে গরু বা পশু। কুদ্সের চারপাশে যেসব কাফের ছিলো তারা ছিলো চূড়ান্ত অবাধ্য এবং তারা ইহুদি ছিলো না। মুজাহিদরা একদিনে তিনটি উপনিবেশ দখল করে নিয়েছিলেন। কুদ্সে যে-তিনটি উপনিবেশ ছিলো মুজাহিদরা একদিনেই সেগুলো দখল করে নেন।

তারপর মাওয়ায়ির নেতৃত্বে মিসরীয় সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তিনি আহমদ আবদুল আযিযকে বলেন, আমার সঙ্গে এই নির্দেশ রয়েছে যে, আপনি আমার আনুগত্য করবেন। আহমদ আবদুল আযিয বলেন, ঠিক আছে, আমরা আপনার আনুগত্য করবো। তবে তাঁর কাছে যখন রাজা ফারুকের নির্দেশ আসে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর আহমদ আবদুল আযিয কায়রোতে যান এবং হাসানুল বান্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হাসানুল বান্না তাঁকে বলেন, আহমদ, আপনি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। আহমদ আবদুল আযিয মিসর থেকে ফিলিস্তিনে ফিরে যান। ফারুক ঘাতক সালেহ সালেমকে আহমদ আবদুল আযিযের কাছে পাঠায়। সে তাঁর কাফেলার ভেতরেই তাঁকে হত্যা করে। তারা ধারণা করেছিলো যে আহমদ আবদুল আযিয হাসানুল বান্নার শিষ্য হয়ে গেছেন এবং আশঙ্কা করেছিলো যে কুদ্স, বায়তে লাহাম, মারে ইলয়াস এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ইহুদিদের মেরে সাফ করে দেবেন। তাই তারা ইসলামি আন্দোলনের এই দুঃসাহসী যুবককে হত্যার

বিকল্প খুঁজে পায় নি। শেষে সালেম সালেহ তাঁকে হত্যা করে। এরপর তারা গ্লুব পাশার নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাদলটিকে গ্রহণ করে। ধারাবাহিকভাকে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে।

ফিলিস্তিনিদেরকে অস্ত্রের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাইরে থেকে যে-যুবকেরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেছিলো, তারা চারটি দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনের বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করেছিলো। হাসানুল বান্না মুস্তফা আস-সাবায়ির নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে এবং সাওয়াফের নেতৃত্বে ইরাক থেকে দুটি দল ফিলিস্তিনে পাঠান। তিনি আবদুল লতিফ আবু কুরাকে জর্ডান, ইরাক ও সিরিয়া থেকে দল নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশের নির্দেশ দেন। ফাওযি আল-কাওকাজি মিসর থেকে উদ্ধারকারী বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। তিনি সবসময়ই সন্দেহের আবর্তে ছিলেন। গ্লুব পাশার অনুমতি নিয়ে তিনি ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন পালিয়ে মিসরে চলে আসেন। আরব রাষ্ট্রগুলো তাঁর পাশে দাঁড়ায়।

হাসানুল বান্না ১৯৪৮ সালের মে বা জুন মাসে আরব রাষ্ট্রগুলোর নেতাদের কাছে এই মর্মে তারবার্তা পাঠান যে, 'আমি প্রথমবারের মতো দশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা নিয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। আপনারা যদি ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাত থেকে মুক্ত করার বিষয়টি ভালো মনে করেন তাহলে আমাকে ফিলিস্তিনে প্রবেশের সুযোগ দিন।' পৃথিবী তখন বসে থাকে নি। তারা এই তারবার্তা পেয়ে ইসলামি আন্দোলনকে নিস্তেজ করতে উঠেপড়ে লাগে। তারা ভাবতে শুরু করে কীভাবে হাসানুল বান্নার পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনকে নিঃশেষ করে দেয়া যায়। ১৯৪৮ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার তিন রাষ্ট্রদূত বৈঠক করেন। তাঁরা হাসানুল বান্নার ইসলামি আন্দোলনকে নিস্তেজ ও তাঁর দলকে ভেঙে দিতে একমত হন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তপত্র মিসরের প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ ফাহমি আন-নাকরাশির কাছে পেশ করেন। তিনি এই দলের সদস্যদের গ্রেফতার ও দলটিকে ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া তাদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ দেন। যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তবে তখনো হাসানুল বান্নাকে আটক করা হয় নি। তিনি জেলখানার বাইরে থেকে যান। আন্দোলনের যে-যুবকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলো তারা ক্রোধে ফুঁসতে থাকে। হাসানুল বান্না তাদেরকে একটি পত্র পাঠান। পত্রে তিনি লেখেন: 'হে আমার ভাইয়েরা, মিসরের ওপর দিয়ে যেসব ঘটনার দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তা যেনো তোমাদের বিচলিত ও চিন্তগ্রস্ত না করে। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাত থেকে মুক্ত করা। যতোদিন একজন ইহুদিও ফিলিস্তিনের মাটিতে থেকে যাবে ততোদিন তোমাদের কর্তব্য শেষ হবে না।'

এর দুই মাস পর ফারুকের রাজকীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান মাহমুদ আবদুল মজিদ হাসানুল বান্নাকে শহরের সবচেয়ে বড়ো রাস্তায় হত্যার চেষ্টা করেন। হাসানুল বান্না এতে আহত হন। তাঁকে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এটিকে রয়্যাল চক্ষু হাসপাতালও বলা হয়। রাজা ফারুক হাসানুল বান্নাকে হাসপাতালের অস্ত্রোপচারকক্ষেই হত্যা করার জন্যে সামরিক কর্মকর্তা মুহাম্মদ ওয়াস্‌ফিকে সেখানে পাঠায়। ওয়াসফি জানতে পারেন হাসানুল বান্না গুরুতর আহত নন। তাঁকে অস্ত্রোপচারকক্ষে হত্যা না করে ইমাম শাফি কবরস্থানের কাছে (জায়গাটি মুসলিম যুবকদের কার্যালয়ের সামনে) নিয়ে আসা হয় এবং গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি হাসানুল বান্নাকে শহীদ করার পরের দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারি থেকেই মিসর রোডস চুক্তির কার্যক্রম শুরু করে। এই চুক্তিতে মিসর এই বিষয়ে একমত হয় যে, ইসরাইলকে নিরাপদ ভৌগলিক সীমার ভেতরে একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। জর্ডানও রোডস চুক্তির বিষয়ে একমত হয় এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তারা আহমদ সিদকি আল-জুনদি থেকে কেবল সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে চায়। এই চুক্তির মাধ্যমে ইহুদিরা ফিলিস্তিনের প্রায় অর্ধেক ভূমি নিয়ে যায়। আমাদের যে-গ্রাম ছিলো, সীমানা চূড়ান্তকরণের সময় আমাদের গ্রাম থেকেও ৩৪ হাজার একর ভূমি ইহুদিদের কব্জায় চলে যায়। মুরজ ইবনে আমের থেকেও একটি গ্রাম চলে যায়। এভাবেই ফিলিস্তিন ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে।

আন্দোলনকে নিস্তেজকরণ

ফিলিস্তিনে যে-সব যুবকেরা যুদ্ধ করছিলো, সেই মুজাহিদদের নিয়ে তারা কী ভাবলো। কী ঘটলো তাদের বেলায়? রাজা ফারুক নির্দেশ দিলো, এই যুবকদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আটকে রাখো। তাদেরকে বলো, হয়তো আমাদের সঙ্গে মিলে তোমরা লড়াই করবে নতুবা তোমাদেরকে আমাদের ট্যাঙ্কের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র, জিহাদ ও লড়াইয়ের ভূমি থেকে তুলে নিয়ে কারাগারে বন্দি করে রাখো। একবছর তারা জেলের ভেতরে থাকবে। ফিলিস্তিনের বিষয়টি মীমাংসা হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু একবছর পর তাদেরকে আর কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয় নি। রাজা ফারুকের পতনের মধ্য দিয়ে জামাল আবদুন নাসের ক্ষমতায় আসে। জেলখানায় বন্দি মুজাহিদদের ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী জামাল আবদুন নাসের ছিলো লম্পট ফারুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তার শাসনামলে মুজাহিদদেরকে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। সরকারি লোকেরা কারাগারে গিয়ে বন্দি

যখনই তারা এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করতো, মাইনটি বিস্ফোরিত হতো। এভাবে চলতে থাকে। অবশেষে আরব ও ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা হন্যে হয়ে তাদের পেছনে লাগে। তারা ফাতাহর যুবকদেরকে মরিয়া হয়ে খুঁজতে থাকে এবং তাদেরকে ধরার জন্যে ফাঁদ পাততে থাকে। এমন ভাব, যেনো তাদেরকে ধরামাত্রই খেয়ে ফেলবে।

রক্তিম রজনী

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের কথা সবারই জানা। ৫ই জুন মিসরের চারশো সামরিক কর্মকর্তা প্রায় ভোর পর্যন্ত একটি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠক পরিচালনা করে ইহুদি উপদেষ্টা বারুখ নাদিল। বারুখ নাদিল বলেন, 'রাত দুইটার সময় বৈঠক শেষ হয়। আমি আশঙ্কা করছিলাম যে তারা ভোর পাঁচটার সময় জেগে উঠবে। কারণ প্রথম আঘাত হানা হবে ভোর পাঁচটায়। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম এবং কর্মকর্তাদের দুটি ভাগে ভাগ করে ফেললাম। পুরুষ কর্মকর্তারা একদলে, আরেক দলে হচ্ছে মহিলা কর্মকর্তারা। মহিলা কর্মকর্তাদের আমি বললাম, তোমরা হলে ইসরাইলি মিরাগ (জঙ্গি বিমান), আর পুরুষ কর্মকর্তাদের বললাম, তোমরা হলে মিসরের মিগ (জঙ্গি বিমান)। এখন আমি মিগ কীভাবে মিরাগকে আক্রমণ করে ভেঙ্গে দেয় তাই দেখতে চাই। আমার এই কথা বলার পর তারা রাত চারটাও বেশি সময় পর্যন্ত মদ, আনন্দ, উল্লাস, হইচই ও মউজ-মাস্তিতে নিমজ্জিত থাকে। পাঁড় মাতাল হয়ে রাত চারটার পর তারা নিজেদের বিছানায় নিক্ষেপ করে। এভাবেই ভোর পাঁচটা বাজে। কায়রোর বিমানবন্দরে আক্রমণ শুরু হয়।

[১৯৬৭ সালের ৫ই জুন ইসরাইল প্বার্শবর্তী আরব দেশগুলোর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। মাত্র তিন ঘণ্টার হামলায় ইসরাইল মিসর, জর্ডান, ইরাক ও সিরিয়ার আকাশসীমা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। তিন দিনের মাথায় ইসরাইলি স্থলবাহিনী সুয়েজখাল এলাকা দখল করে নেয়। একই গতিতে তারা মিসর ফ্রন্টে গাজা ও সিনাই উপত্যকা, জর্ডান ফ্রন্টে পূর্ব-জেরুযালেম ও পশ্চিমতীর এবং সিরিয়া ফ্রন্টে গোলান মালভূমি দখল করে মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের আয়তন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এই যুদ্ধে মিসরের ১০-১৫ হাজার সেনা নিহত ও নিখোঁজ হয় এবং ৪৩৩৮ সেনাকে বন্দি করা হয়। জর্ডানের ৬ হাজার সেনা নিহত ও নিখোঁজ হয় এবং ৫৩৩ সেনাকে বন্দি করা হয়। সিরিয়ার সেনা নিহত হয় ২৫০০ জন এবং আটক হয় ৫৯১ জন। ইরাকের ১০ সেনা নিহত এবং আহত হয় ৩০ জন। অপর পক্ষে ইসরাইলের মাত্র ৭৭৬-৯৮৩ সেনা নিহত ও ১৫ জন বন্দি হয়।

যুবকদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কি ফিলিস্তিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছো? যারা এই প্রশ্নে উত্তরে হ্যাঁ বলেছে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীনব কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। অথচ দাবি করা হয় যে, জামালের সরকার ছিলো গণতান্ত্রিক সরকার। ফিলিস্তিনের যুদ্ধে যেসব যুবক কমান্ডার বা দলপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলো তাদের সবাইকে ফাঁসি দেয়া হয়। মুহাম্মদ ফারগালিকে—যিনি কয়েকটি মুজাহিদদলের নেতার দায়িত্ব পালন করেছিলেন—ফাঁসি দেয়া হয়। ইউসুফ তালাআতকে ফাঁসি দেয়া হয়। হানদাবি দাবির, মাহমুদ আবদুল লতিফ, ইবরাহিম আত-তায়্যিব, ইসলামি আইনের পুনর্বাস্ত বায়নকারী ও সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুল কাদির—এঁদের সবাইকে ফাঁসি দেয়া হয়। ইসরাইল এ-ব্যাপারে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করে এবং তাঁদেরকে ১৯৫৪ সালে শেষের দিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালে আবারো ইসরাইল মিসরকে প্ররোচনা দিতে এগিয়ে আসে এবং ১৯৬৬ সালে জামাল আবদুন নাসের সাইয়্যেদ কুতুব রহ.-কে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তাঁর অনুসারী ১৭ হাজার কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইসরাইল আবারো এগিয়ে আসে এবং সুয়েজখাল পর্যন্ত দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কারণ মিসরে যারা ইসরাইলবিরোধী ছিলো সেই সব মুসলিম যুবকেরাই এতোদিন লড়াই করেছে। তাদেরকেই ফাঁসি দেয়া হয়েছে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। যদিও তারা সবসময় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ছিলো, শাহাদাতের জন্যে ব্যাকুল ছিলো।

ফাতাহ

গেরিলা ও কমান্ডো কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে ১৯৬৫ সালে ফাতাহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাতাহর শুরুটা ছিলো খুব উৎকর্ষপূর্ণ। একদল দুঃসাহসী যুবক এই মর্মে শপথ করে যে মৃত্যু পর্যন্ত অথবা আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত আমরা ফিলিস্তিনে লড়াই চালিয়ে যাবো। ১৯৬৫ সালেই তারা দামেস্কের হাম এলাকায় প্রশিক্ষণগ্রহণ শুরু করে। তারা ছিলো পৌরুষ ও সাহসিকতার বাস্তব দৃষ্টান্ত। আমরা যখন তাদের সামনে দাঁড়াতাম সমীহ ও সম্মানের সঙ্গে দাঁড়াতাম। যারা এই সংগঠনটি শুরু করেছিলো তাদের একজনের কথা না বললেই নয়। সে তার পরনের কাপড়ের নিচে করে দামেস্কের হাম থেকে পূর্বতীরে মাইন নিয়ে যেতো। সারাদিন ঘুমাতো এবং সারারাত হাঁটতো। পূর্বতীরে যেভাবে প্রবেশ করতো পশ্চিমতীরেও সেভাবে প্রবেশ করতো। একসময় সে ১৯৪৮ সালে দখল-করা ইসরাইলের একেবারে ভেতরের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। সে ঘাঁপটি মেরে থাকতো এবং যখনই কোনো ইহুদি বা তাদের গাড়ির দেখা পেতো তাদের সামনে মাইন পুঁতে রাখতো।

ইসরাইল আক্রমণ শুরু করার আগে ইহুদিরা কীভাবে মিসরীয় সামরিক কর্মকর্তাদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়েছিলো তার বিবরণ ইহুদি উপদেষ্টা বারুখ নাদিলের কথা থেকে জানা যায়।]

বারুখ নাদিল تحطمت الطائرات عند الفجر / প্রত্যুষে বিমানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে গ্রন্থে আরো বলেন, 'আমাদের আক্রমণের বিপরীতে কায়রো বিমান বাহিনী নিজেদের রক্ষা করতে পারে নি বা কোনো জবাব দিতে পারে নি। আমি বিমানবন্দর থেকে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানগুলো থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখছিলাম। এরপর কর্মকর্তারা জেগে ওঠে এবং হুঁশ ফিরে পায়। তারা বলে, "যা ঘটেছে তার দায় আমাদেরই নিতে হবে। আমরা একশো ভাগ জানতাম, সোমবারই আক্রমণ করা হবে এবং একশো ভাগ জানতাম প্রথম আক্রমণ করা হবে বিমান বাহিনীর ওপর।" মার্কিন রাষ্ট্রদূত সন্ধ্যা সাতটায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রুশ রাষ্ট্রদূত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন হামলার দুই ঘণ্টা আগে ভোর তিনটায়। তারা তাকে বসিয়ে রাখে যাতে সে ফজরের আগে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারে!' [তারা আবদুন নাসেররের সঙ্গেও সন্ধ্যা সাতটায় ও ভোর তিনটায় যোগযোগ করে এবং আক্রমণ না করতে তাকে অনুরোধ জানায়।]

বিশ্বাসঘাতকতার লজ্জাজনক পরিণাম

এরপর গোটা সামরিক বাহিনী ভেঙ্গে পড়ে। সংবাদ আসে, বিমান বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসো। অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে এসো না। অস্ত্র ফেলে দিয়ে তারপর আসো। আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সকাল এগারোটার দিকে জর্ডান কায়রোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। এমনটিই সা'দ জুমআ তাঁর 'ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। জর্ডান কায়রোকে জিজ্ঞেস করে, কী অবস্থা তোমাদের? যুদ্ধ হচ্ছে কেমন? কায়রো জবাব দেয়, শত্রুদের তিনটি বিমান ভূপাতিত করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের বিমান তেল আবিবের আকাশে রয়েছে। হায় খোদা, কী জঘন্য মিথ্যা! হে রাষ্ট্রপতিরা, তোমাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। তিনটি বিমান ভূপাতিত করার কথা বলা হলেও আরব ভূখণ্ডে যে-ইসরাইলি স্থল বাহিনী তাদের ট্যাঙ্ক-কামান নিয়ে প্রবেশ করেছিলো তাদের ওপর একটি গোলাও নিক্ষেপ করা হয় নি। আরব সেনাবাহিনীকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে তারা যেনো ইসরাইলি বাহিনীর ওপর প্রতি-আক্রমণ না করে। এই নির্দেশপত্রে সালমা নামের একজন স্বাক্ষর করে। নির্দেশপত্রের সঙ্কেতলিপিতেও নেতার নাম ছিলো সালমা।

আমি ইসরাইলি বাহিনীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ইসরাইলের যে-স্টেশনে তারা তারবার্তা সংগ্রহ করছিলো সে স্টেশনও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। এক ঘন্টা পর পর তারা এই বার্তা পাচ্ছিলো, আমরা শত্রুদের তিনটি বিমান ভূপাতিত করেছি। আমাদের বিমান তেল আবিবের আকাশে রয়েছে। হায় খোদা, কী জঘন্য মিথ্যা! ইসরাইলি বাহিনী জর্ডানে প্রবেশ করার পর চব্বিশ ঘন্টারও আগে ঘোষণা দেয় যে, আমরা দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা-ফ্রন্টে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি। আমি তখন রেডিও শুনছিলাম। ইসরাইলি বিমান আমাদের ওপর বোমা বর্ষণ করছিলো এবং স্থলবাহিনী ট্যাঙ্কবহর নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। আল্লাহর কসম, আমি ভাবছিলাম, দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা-ফ্রন্ট বোধ হয় কুদ্‌স (জেরুজালেম) থেকে আমাদের জানিন শহর পর্যন্ত বা শাফাত পর্যন্ত বা তার চেয়ে দুইতিন কিলোমিটার পর শায়খ জার্‌রাহ-এর এলাকা পর্যন্ত হবে। আসলে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা-ফ্রন্ট ছিলো জর্ডানের সালাত পর্বতমালা পর্যন্ত।

সিরিয়া ফ্রন্টে গোলান মালভূমির দিকে ইসরাইলি বাহিনী কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই এগিয়ে আসছিলো। গোলানে ধাবমান ইসরাইলি ট্যাঙ্কবহরে একটি গোলাও নিক্ষিপ্ত হয় নি। চার্চিল তাঁর The Six-Day War[৪৯] গ্রন্থে লেখেন, ইসরাইলি ট্যাঙ্কবহর গোলান মালভূমিতে পথ তৈরি করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। ট্যাঙ্কবহরের সামনে বুলডোজার দিয়ে পথ তৈরি করছিলো এবং গোলান পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। অপর দিকে সিরিয়ান গোলন্দাজ বাহিনী টনকে টন গোলা নিক্ষেপ করছিলো, ইসরাইলি বাহিনীর ওপরে নয়, বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ও বিরান এলাকায়। এই সময় একটি ঘটনা ঘটে। পিছু হটার সময় মিসরীয় ট্যাঙ্কবহরের একটি ট্যাঙ্কের শিকল বিকল হয়ে যায়। আর ওদিকে এক গোলন্দাজ তার কামানের মুখ ইসরাইলি ট্যাঙ্কবহরের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং ছয়টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দেয়। এতে সে-জায়গায় ইসরাইলি বাহিনীর অগ্রযাত্রা আট ঘন্টার জন্যে ব্যাহত হয়।

সা'দ জুমআ জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের সময়ও তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি তখন স্বীকার করেন নি যে, বিষয়টি এই পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি তখন সত্যও বলেন নি। তবে তিনি বুকে যা জমিয়েছিলেন সেসব বের করে দিয়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। ইসলাম ও আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রগুলো দেখার পর তিনি ধমনিতে রক্ত জমাট-বাঁধা রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই রোগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তিনি কয়েকটি বই

---

[৪৯] ১৯৬৭ সালের ৫ থেকে ১০ই জুন আরব ও ইসরাইলের মধ্যে যে-যুদ্ধ হয়েছিলো তাকেই The Six-Day War বলা হয়। দেখুন : টীকা ৫।

লিখেছেন এবং বইগুলোতে তাঁর পেটে যা কিছু ছিলো সব বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি বইয়ে তাঁর হৃদয়-যাতনা, মর্মপীড়া, হতাশা ও অপরাধবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি أبناء الأفاعي 'সর্পসন্তান' বইটি লিখেছেন এবং বইটির প্রচ্ছদে একগুচ্ছ সাপের ছবি দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি المؤامرة ومعركة المصير 'ষড়যন্ত্র ও শেষ লড়াই' এবং الله أو الدمار 'আল্লাহর পথে, না-হয় ধ্বংস'— গুরুত্বপূর্ণ বই দুটি লিখেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর পথে ফিরে যাওয়া বা ধ্বংস হওয়া ছাড়া সমস্যা সমাধানের আর কোনো পথ নেই।'

সা'দ জুমআ আরো বলেন, 'আমরা সিরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাদেরকে জানালাম, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা ভুল করেছি। এই প্রেক্ষিতে সকাল এগারটার দিকে তাদের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছলাম যে, আমরা যুদ্ধ শুরু করবো। কিন্তু তারা বলে, এক ঘণ্টা পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন। এক ঘণ্টা আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারা আবার বলে, এক ঘণ্টা পর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে (যুদ্ধ শুরু করার) বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন। এখনো সিরিয়া তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে নি। এখনো আমরা তাদের জবাবের অপেক্ষায় আছি।' সিরিয়া কেনো যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের বিষয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায় নি, সে-বিষয়ে তিনি বলেন, 'সিরিয়ার নির্লিপ্ততার কারণ আমরা পরে জানতে পেরেছি। দামেস্কে অবস্থিত একটি বড়ো রাষ্ট্রের দূতাবাসে ইসরাইল থেকে একটি তারবার্তা আসে। রাষ্ট্রদূতকে জানানো হয়, "যদি সিরিয়া আমাদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে তাহলে আমরা তাদেরকে স্পর্শ করবো না। তাদের সঙ্গে আমাদের উচ্চপর্যায়ের যৌথ অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে-কারণেরই আমরা সিরিয়ার প্রতি করুণাশীল হচ্ছি এবং তাদেরকে ধ্বংস করছি না।"

একারণেই সিরিয়া নির্লিপ্ত থেকেছে। ইসরাইল ট্যাঙ্কবহর নিয়ে জর্ডান ফ্রন্টের দিকে এগিয়ে আসে এবং জর্ডান ফ্রন্টকে ধ্বংস করে দেয়। এরপর তারা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং সিরিয়ায় প্রবেশ করে।

ফাতাহর বিশৃঙ্খলা

ফাতাহ এই পরাজয় প্রত্যক্ষ করে। ফাতাহর সদস্যরা আরব বিশ্বের এই বিপর্যয় দেখে তারা মর্মাহত হয়। তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের আহ্বান জানায়। ফাতাহর সঙ্গে যারা ছিলো, তারা অল্প সংখ্যক ভালো মানুষ। তারা ছিলো চরম দুঃসাহসী। ফাতাহর সদস্যরা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানায়, তোমারা আসো, আমরা ইসরাইলের সামনে

দাঁড়াবো। ইসরাইলের চারপাশের আরব রাষ্ট্রগুলো ব্যর্থ ও পরাজিত হয়েছে। তারা 'না' বলতে পারে নি। ফাতাহর সদস্যরা আহ্বান জানায়, হে মুসলমান, হে আলেম-ওলামা, হে ফিলিস্তিনের সন্তানেরা, তোমরা এগিয়ে আসো। কেউ এগিয়ে আসে নি। কে এগিয়ে আসবে? তারাই কেবল এগিয়ে এসেছিলো যারা সামরিক তৃতীয় স্তরের প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণে অকৃতকার্য হয়েছিলো বা জর্ডানের সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পালিয়ে এসেছিলো। তারা কোনো কাজ পায় নি বলে ফাতাহর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো।

এই বিপুল সংখ্যক লোক সে-সময় ফাতাহ-এ প্রবেশ করেছিলো। এ-কারণে ফাতাহর অভ্যন্তরীণ জঞ্জাল বেড়ে গিয়েছিলো এবং এই জঞ্জালের নেতৃত্ব দেয়া কঠিন কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। যারা ফিলিস্তিন নিয়ে ব্যবসা করেছিলো তারাও ফাতাহর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। এমনকি প্রায় সব মতাদর্শের লোক ফাতাহর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। বামপন্থীরা যোগ দিয়েছিলো, কমিউনিস্টরা যোগ দিয়েছিলো, প্রগতিশীল ও পুনর্জাগরণবাদীরা যোগ দিয়েছিলো এবং জাতীয়তাবাদীরাও যোগ দিয়েছিলো। এভাবে সব ধরনের লোক ফাতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের সবাই নিজ নিজ মতাদর্শ বিস্তার করার চেষ্টা করেছে; নিজেদের মতো কাজ করেছে; কেউ ইসরাইলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় নি। তাদের দিকে কেউ একটি বুলেটও ছোঁড়ে নি।

হ্যাঁ, আমি তখন তাদের সঙ্গে ছিলাম। ইসরাইলের বিরুদ্ধে অপারেশন চলছিলো। কিন্তু সেই অপারেশন কারা চালাচ্ছিলো? ফিলিস্তিনের সেসব সন্ত ানেরাই অপারেশন চালাচ্ছিলো যাদের ভেতর শুদ্ধ ও পবিত্র চেতনা ছিলো। তাদের ভেতরে মাতৃভূমির জন্যে ভালোবাসা ছিলো, আত্মসম্মানবোধ ছিলো। কেউ কেউ এমন ছিলো, যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে অপারেশন পরিচালনা করার পর অবশিষ্ট অস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কাজে লাগানোর জন্যে রেখে দিতো। তারা সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো। এই লড়াইয়ে প্রলেতারিয়েত—শ্রমিক ও মজদুরশ্রেণির জয় হয়েছিলো। এরা ছিলো সমাজতন্ত্রের প্রতীক। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কসম, সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিহত হয়েছে এমন যুবককে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, প্রলেতারিয়েত কী? সে জবাব দেয়ার আগে চিন্তা করতো, প্রলেতারিয়েত হচ্ছে রাশিয়া বা সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস, তাদের শোষণে পীড়িত ও বিপর্যস্ত। বা প্রলেতারিয়েত হচ্ছে আমেরিকার গ্রাস, শোষিত ও নিপীড়িত। এভাবে ফাতাহর অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের প্রবেশ ঘটেছিলো। এমনকি প্রত্যেকদিন যে-সঙ্গীত দিয়ে তাদের রেডিওর সম্প্রচার শুরু হতো সেটাও ছিলো সমাজতন্ত্র-সঙ্গীত। সেই সঙ্গীত—আমার যতোটুকু মনে পড়ে—ছিলো এমন :

أنا يا أخي، أنا يا أخي، آمنت بالشعب المضيع والمكبل، وحملت رشاشي، لتحمل بعدنا الأجيال

'হে আমার ভাই, আমিও, এবং আমিও পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছি নিপীড়িত-নিগড়িত জাতির প্রতি এবং বহন করেছি মেশিনগান, যাতে তা কাঁধে তুলে নেয় প্রজন্মের পর প্রজন্ম।'

পরবর্তী প্রজন্ম কী বহন করবে? কুরআন?! না-কি আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কাস্তে বহন করবে?! আমরা এই জন্যে লড়াই করছি যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হাতে কাস্তে ও হাতুড়ি তুলে নেবে? হ্যাঁ, এভাবেই সমাজতন্ত্রের নিশানা-নিদর্শন ফাতাহর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলো। সমাজতন্ত্রীরা প্রচারযন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের মতাদর্শ ও মত প্রচারে তা পুরোদস্তুর ব্যবহার করে। তারা ফিলিস্তিনি যুবকদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে চুরি করে নিয়ে যায় এবং বামপন্থায় দীক্ষিত করে।

একবার তারা আমার কাছে আসে। আমি তখন ইসলামি আইনে স্নাতকোত্তর শেষ করেছি। তারা আমাকে ধরেবেঁধে নিয়ে যেতে চায়। কীভাবে আমি তাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করি। গেলাম তাদের সঙ্গে তাদের ঘাঁটিতে। তাদের একজন বলে, আবু মুহাম্মদ, আমাদের অনেকেই শহীদ হয়েছে। আপনি এদিকে আসুন। আমি তাদের আস্তানায় প্রবেশ করলাম এবং নিঃস্ব ও দুর্বল একদল তরুণকে দেখতে পেলাম। আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম তোমার? সে বললো, চে গুয়েভারা[৫০]। আরেকজনকে জিজ্ঞেস

---

[৫০] পুরো নাম এর্নেস্তো চে গুয়েভারা দ্য সের্নার। সমাজতান্ত্রিক ভাবানুসারী লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী, তাত্ত্বিক ও গেরিলা নেতা। চের জন্ম ১৯২৮ সালের ১৪ই জুন আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে। পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। ১৯৫৩ সালে গুয়াতেমালার হাকোবো আর্বেনজ্-এর বামপন্থী সরকারে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে এ-সরকারের পতন হলে মেক্সিকোতে চলে যান এবং ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত কিউবার রাজধানী হাভানা দখলের লড়াইয়ে চে গুয়েভারা কাস্ত্রোর অনুগত বাহিনীর সদস্য হিসেবে অংশ নেন। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি কিউবার ক্ষমতাসীন সরকারপ্রধান বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত করে কাস্ত্রো নতুন সরকার গঠন করলে চে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদসহ শিল্পমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে তাঁকে আর জনসমক্ষে দেখা যায় নি। এ-বছরেই কোনো এক সময়ে গেরিলা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে বলিভিয়ায় যান। ১৯৬৭ সালে সান্তাক্রুজের কাছে তাঁর নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী বলিভীয় সেনাবাহিনীর হাতে নির্মূল হয়। এ-বছরের ৮ই অক্টোবর আহতাবস্থায় ধরা পড়ার পর ৯ই অক্টোবর ভ্যালেগ্রান্ডার লা হিগুয়েরায় বন্দি চেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। চের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : বলিভিয়ার ডায়েরি; দ্য মটর সাইকেল ডায়েরিজ; ডেকে যাই; গেরিলা যুদ্ধ।

করলাম, তোমার নাম কী? সে বললো, আমার নাম কাস্ত্রো[৫১]। হায় আল্লাহ, এই কাস্ত্রোর বয়স ছিলো মাত্র পনেরো। তোমার নাম কী, আমি আরেকজন তরুণকে জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, আমার নাম হো চি মিন[৫২]। শেষে যাকে নাম জিজ্ঞেস করলাম, সে বললো, আমার নাম মাও[৫৩]। আমি খুব দুঃখ পেলাম। আমি কোনো আরবি নামও শুনি নি, ইসলামি নামও শুনি নি। আমরা তাদেরকে বললাম, তোমরা নিজেদের নাম রেখেছো চে গুয়েভারা, ক্যাস্ট্রো, হো চে মিন এই সব নাম। কেনো, আবু উবায়দা, উমর, হামযা, মুসআব, কা'কা ইত্যাদি নাম কি তোমাদের জানা ছিলো না?

---

[৫১] পুরো নাম ফিডেল আলেজান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ। ১৯২৬ সালের ১৩ই অক্টোবর কিউবার ওরিয়েন্ট প্রদেশের প্রদেশে জন্ম। দায়িত্ব পালন : কমিউনিস্ট পার্টি অব কিউবা-এর ফার্স্ট সেক্রেটারি (জুলাই ১৯৬১-১৯ শে এপ্রিল, ২০১১); কিউবার পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি (২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৬- ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮); ষোড়শ প্রধানমন্ত্রী (১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯- ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮); জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)-এর সপ্তম ও ত্রয়োবিংশ মহাসচিব।

[৫২] এটি তাঁর ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম ন্‌গুয়েন্ থাট্ থান্। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোচীন অর্থাৎ ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট (১৯৪৫-১৯৬৯)। জন্ম ১৮৯০ সালের ১৯ শে সাবেক ফরাসি-আশ্রিত রাজ্য আন্নামের ন্‌গেয়ান প্রদেশের হোয়াংট্রু গ্রামে। ১৯৬৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৫৩] মাও জে দং ১৮৯৩ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর চীনের হুনান প্রদেশের শাওশাং গ্রামের এক কৃষক পরিবারে গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে সাম্যবাদী বিপ্লবী, চীনা রাষ্ট্রনেতা, গণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (প্রতিষ্ঠা : ১৯২১ সালের জুলাই) অন্যতম সংগঠক। দায়িত্ব পালন : চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভাপতি (১৯ শে জুন, ১৯৪৫-৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬) এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান (২০ শে মার্চ, ১৯৪৩-২৪ শে এপ্রিল, ১৯৬৯)। গণতন্ত্রী চীনের প্রথম চেয়ারম্যান (২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪- ২৭শে এপ্রিল, ১৯৫৯)। মাও মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ১৮ বছরের কন্যা লাও ইজিয়ুকে বিয়ে করেন এবং এরপর আরো তিনটি বিয়ে করেন। চতুর্থ স্ত্রী জিয়াং চিং বয়সে তাঁর থেকে ২১ বছরের ছোটো ছিলেন। শেষ তিন স্ত্রীর ঘরে তাঁর হয়েছিলো মোট ১০ সন্তান। ১৯৭৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তিনি বেইজিংয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সংগ্রামী নেতার প্রতীকে পরিণত হলেও বিভিন্ন মহলের সমালোচনার পাত্র হয়ে ওঠেন। তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural Revolution) নামে চীন থেকে ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি প্রায় মুছে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : On Guerrilla Warfare (1937); On Practice (1937); On Contradiction (1937); On Protracted War (1938); In Memory of Norman Bethune (1939); On New Democracy (1940); Talks at the Yan'an Forum on Literature and Art (1942); Serve the People (1944); The Foolish Old Man Who Removed the Mountains (1945); On the Correct Handling of the Contradictions Among the People (1957).

সেখানে সমাজতন্ত্রীদের যে-বিপ্লবী শিক্ষাদাতা ও নেতা ছিলো সে আমার প্রতি অভিযোগ আরোপ করতে থাকে। এই নেতা আগে একটি ডাকাতদলের সর্দার ছিলো। এখন সে কাতারে তার কর্মে নিয়োজিত আছে। সেই ডাকাতসর্দার আমাকে সামরিক বিচারের মুখোমুখি করার জন্যে আমার পেছনে লোক লাগায়। তাদের অভিযোগ : আমি চে গুয়েভারার সমালোচনা করেছি। এসব কারণেই ফাতাহর সঙ্গে যেসব বিপ্লবী যুক্ত হয়েছিলো তাদেরকে আমি কিছুদিন পরেই বিশ্বাসহীন সমাজতন্ত্রীতে পরিণত হতে দেখেছি। তারা কোনো কৌশল ও রণনীতি অবলম্বন না করেই তাদের আন্দোলন চালিয়েছে। তারা পানিতে ছুরি চালানোর মতো অর্থহীন কাজ করেছে।

জর্ডান সরকার তাদের দেশ থেকে বিপ্লব তাড়াতে চাইলো। তাদের কী করা উচিত? লোকেরা খুব বুদ্ধিমান। তারা সরকারকে পরামর্শ দিলো, চিন্তা কি, আপনাদের হাতে দুটি অস্ত্র আছে। এক হচ্ছে তৃতীয় স্তরের প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ। এটিকে আপনারা বাতিল করে দিন; অর্ধেক লোক বিপ্লব থেকে ফিরে আসবে। আরেকটি অস্ত্র হচ্ছে সেনাবাহিনীতে জোরজরবদস্তিমূলক নিয়ুক্তিকরণ। এটিকেও আপনারা বাতিল করে দিন; বাকি অর্ধেক বিপ্লব ত্যাগ করবে। এরপরেই একদিন জর্ডানের মন্ত্রীসভার বৈঠক বসে। সেই সভায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় 'তৃতীয় স্তরের প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ' ও 'সেনাবাহিনীতে জোরজরবদস্তিমূলক নিয়ুক্তিকরণ' প্রকল্পদুটি বাতিল করা হবে। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর একদিনের ভেতরেই বিপ্লবীদের অর্ধেক ঘাঁটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। আসলে তাদের কোনো আদর্শ ছিলো না। তারা ঝোঁকের বশে ও নানা ব্যক্তিগত কারণে ইসলামি আন্দোলনের যুবকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, এখন কোথায় আপনারা? কোথায় আপন্যদের ইসলামি আন্দোলন? আমি তাকে বলেছি, ইসলামি আন্দোলন ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ছিলো, ১৯৬৭ সালেই তা সঙ্কুচিত হয়েছে এবং যে-সামান্য উন্নতি লাভ করেছিলো তা ১৯৬৭ সালেই করেছিলো।

গেরিলা কার্যক্রমের বিলুপ্তি

নেতাদের গৃহীত কৌশল অনুসারেই কার্যক্রম চলছিলো। কিন্তু সবক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সমতা ও সমন্বয় রক্ষিত হচ্ছিলো না। সত্য যে আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। এসব ব্যাপারে তাদের প্রতি আমার যে-আপত্তি ছিলো, তা নিয়ে আমি কিছু ভাবি নি। তবে ইসলামি আন্দোলনের ব্যাপারে এই কৈফিয়ত অবশ্যই পেশ করতে পারি যে, এই আন্দোলনের সব নেতাকর্মীই কারাগারে বন্দি ছিলেন। প্রেসিডেন্ট যখন ঘোষণা দিলেন যে, আমরা একদিনেই সতেরো হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছি, তখন থেকেই এই সংগঠনের বিপর্যয়

শুরু হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তা দীর্ঘায়ত হয়।
প্রথমে জর্ডানে গেরিলা কার্যক্রমের বিনাশ ঘটে। তারপরে সিরিয়াতেও একইভাবে গেরিলা কার্যক্রমের বিলুপ্তি ঘটানো হয়। এরপর লেবাননে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সেখানে সংঘর্ষ বাঁধার পর থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোর ইশারায় গোয়েন্দারা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে লেগে যায়, এমনকি তাদেরকে জবাই করে হত্যা করতে থাকে। এরপর ইহুদিরা তাদের মিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ইহুদিরা বলে, আমরা জর্ডানে গেরিলাদের শেষ করে দিয়েছি। সিরিয়াতেও তারা রেহাই পাবে না। সিরিয়া থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হবে। সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে লেবাননে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই তাদের শেষ করা হবে। আমরা তাল আল-যাতারে প্রবেশ করেছি এবং গুঁড়িয়ে দিয়েছি। তারা বলে, আমরা চাই না, লেবাননে কোনো ফিলিস্তিনি অস্ত্র ধারণ করুক।
ভালো কথা, আমরা লেবাননে এটাই করতে পারছিলাম। আমরা তাদেরকে আহ্বান জানালাম, তোমরা আসো। তারা আসে এবং লেবানন অবরোধ করে। এরপর মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করে। তারা বলে, আমরা তোমাদের নারী ও শিশুদের প্রতি করুণাবশত তোমাদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে যাচ্ছি। তোমরা বেরিয়ে আসো এবং অস্ত্র ত্যাগ করো। আমরা তোমাদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ইয়ামেন, আলজিরিয়া এবং তিউনিশিয়ায় পাঠিয়ে দেবো। প্রত্যেক দেশে তোমরা ভাগ হয়ে চলে যাবে। ইহুদিদের এই আহ্বানে ইসলামি আন্দোলনের গেরিলারা বেরিয়ে আসে এবং নারী ও শিশুদের রেখে আসে। এই সুযোগে আল্লাহর শত্রুরা, ইহুদিরা ও অন্যরা আক্রমণ করে বসে এবং সাবরা ও শাতিলায়[৫৪] নারী ও শিশুদের জবাই করে হত্যা করে।
এতোকিছুর পরও তাদের কী হয়েছে? কিছুই হয় নি এবং হবেও না। গত বছর মহান আল্লাহ এই পবিত্র জিহাদকে দখলকৃত ভূমির অভ্যন্তরেও বিস্তৃত করে দিয়েছেন। শুরু থেকেই মুসলিম যুবকেরা এই জিহাদ চালিয়ে আসছে। অপারেশনও তারা চালিয়েছে। বিপ্লবীরা এই বিষয়ে কিছু জানে না। যদিও তারা বারাক, গাজা ও জাবালিয়ায় কিছু অপারেশন পরিচালনা করেছে। এরপর মানুষ বিপ্লবী হওয়ার চেষ্টা করে এবং মুমিন ও ফাসেক, ভালো ও মন্দ সবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আল-ইনতাফাদা আল-ফিলিস্তিনিয়্যাহ-এর পবিত্র লড়াইও শুরু হয়। পর্যবেক্ষণে এই বিষয়টি অনুধাবন করা গেছে যে,

---

[৫৪] ইহুদি ও খ্রিস্টান ফালাংগিস্ট মিলিশিয়া বাহিনী ৬ই সেপ্টেম্বর লেবাননের পশ্চিম বয়রুতের সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে গণহত্যা চালায়। ওই দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত তারা তিন হাজার পাঁচশোরও বেশি ফিলিস্তিনি মুসলমানকে হত্যা করে।

ইসলামি আন্দোলনে যখন সব শ্রেণির লোক অংশগ্রহণ করেছে তখন সেখানে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সংগঠন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেক অর্থও ব্যয় করেছে। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শোকর, মুসলিম যুবকেরা ফিলিস্তিনি আন্দোলনের গতিপথ ও ফিলিস্তিনের নেতাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। বামপন্থা, কাস্তে ও হাতুড়ি যাদেরকে বিপথগামী করেছিলো তাদেরকেও তারা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

মাহমুদ দারবিশ, সামিহ আল-কাসিম এবং তাওফিক যিয়াদ এই তিনজন হলেন বামপন্থী কবি ও লেখক। তাওফিক যিয়াদের উপাধি হয়েছে 'ধরিত্রী দিবস'। এখন তাঁর নাম দাঁড়িয়েছে ধরিত্রী দিবস তাওফিক যিয়াদ। তিনিই ৩০শে মার্চ ধরিত্রী দিবসের ধারণা প্রকাশ করেন। তাওফিক যিয়াদ বামপন্থী কমিউনিস্ট। তিনি ইসরাইলি জ্ঞানের মাধ্যমে আমেরিকা থেকে অর্থ উপার্জন করেন। তাওফিক যিয়াদ ও সামিহ আল-কাসিম ইসরাইলি গির্জায় ছিলেন।

আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম তত্ত্বাবধায়ক। ফিলিস্তি নি আন্দোলনের গতিপথ ও ফিলিস্তিনি নেতারা ইসলামের দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। হামাস আল্লাহপাকের অনুগ্রহের ফলেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আমরা আশা করি আল্লাহপাক এর এগিয়ে যাওয়ার পথে বরকত দান করবেন। ইসলাম ছাড়া ফিলিস্তিন-সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। মুসলিম যুবকরা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান অন্যরা করতে পারবে না। বিপ্লবীরা এতে সন্তুষ্ট হোক আর না হোক। তারা নিজেদের নিয়েও সন্তুষ্ট আছে। বিপ্লবের অভ্যন্তরেই গলদ রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা বা দীন থেকে সরে আসা ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করবে না। এতে করে ফিলিস্তিন দিন দিন ধ্বংসের পথেই এগিয়ে যাবে। হন্তারক পরিবেশ-পরিস্থিতি বিরাজ করবেই। কোনোদিন এর কোনো শেষ দেখা যাবে না। ইহুদিরা দাবি করতেই থাকবে এবং ফিলিস্তিন সে-দাবি মেটাতেই থাকবে। অধঃপতনের পর অধঃপতন ঘটতে থাকবে। তাদেরকে স্বীকৃতির পর স্বীকৃতি দিতেই হবে। এদের সঙ্গে কখনো সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো যাবে না। এরা নবীদেরকে হত্যা করেছে। একদিনে সত্তর জন নবীকে হত্যা করেছে। যাকারিয়া আ.-কে হত্যা করেছে। এরা আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এদের ধর্ম হলো : এরা ঈদের দিনের রুটি খ্রিস্টান বা মুসলমানের রক্তে ভিজিয়ে খায়।

আবু তাওমার ঘটনাটি দামেস্কে একটি বহুল আলোচিত ঘটনা। ইহুদিদের ঈদের রাত এলে তারা রক্ত খুঁজে বেড়াতে লাগলো। তাদের কাছে কোনো মুসলমান বা খ্রিস্টান ছিলো না যার রক্তে তারা রুটির খামিরা তৈরি করতে পারে। তারা আবু তাওমার কাছে তাঁর এক ইহুদি বন্ধুকে পাঠালো। আবু

তাওমা ডাক্তার ছিলেন। ইহুদি ধর্মগুরুরা (আরবিতে বলে হাখাম বা রাব্বি) সভা করে পরামর্শ করলো আমরা একজনকে চাই। তাদের এক সভাসদ বললো, আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে, নাম আবু তাওমা। আমরা তাকে আমাদের একজন রোগী আছে বলে এখানে নিয়ে আসতে পারি। তারা আবু তাওমাকে তাদের আস্তানায় নিয়ে যায়। তাকে জবাই করে তার রক্ত নিংড়ে নিয়ে রুটির খামিরা তৈরি করে। এখানেই শেষ নয়। এরা প্রতিদিন বলে, ফিলিস্তিনিদের প্রতিটি বাড়ি গুঁড়িয়ে দাও। প্রত্যেক পবিত্রকে কলঙ্কিত করো। একজন ইহুদিকে একটি পয়সা দিয়ে উপকার করতে চাইলে প্রতিটি জীবিতকে হত্যা করো। এরা প্রতিদিন তিনবার তিনটি ধর্মকে গালি দেয়, সেই ধর্মের নেতাদের গালি দেয়। এরা মানুষকে ধোঁকা দেয় যেনো ছোটো বাচ্চাদের ধোঁকা দিচ্ছে।

এখন কোনো সমাধান নেই। কাবুলে যে-পথ অনুসরণ করা হয়েছে জেরুজালেমেও একই পথ অনুসরণ করতে হবে। কাবুল যেভাবে বিজয় অর্জন করেছে, জেরুজালেমও সেভাবে বিজয় অর্জন করবে। মুসলিম সন্তানদের ইসলামের আদর্শে দীক্ষিত করতে হবে। তারা হৃদয়ের ভালোবাসা থেকে জান্নাতের আশায় জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের জন্যে তারা বুকের রক্ত ব্যয় করবে। তারা এই পৃথিবীতেই আয়তলোচনা হুরদের মোহর পরিশোধ করবে। তারা আল্লাহর পথে তাদের জানকে সস্তায় কুরবান করবে।

আমার কথা এখানেই শেষ। আমি আমার জন্যে এবং আপনাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পরিশিষ্ট

[যে-আমেরিকা আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে আফগানদের সহায়তা করে ছিলো সেই আমেরিকাই ২০০১ সালে আফগানিস্তানে আক্রমণ করে। তাদের স্বার্থোদ্ধারের দ্বৈতনীতি বোঝার জন্যে নিম্নোক্ত ভাষণটির পাঠ জরুরি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জ্যঁ কার্ক প্র্যাট্রিক ১৯৮২ সালে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে এই ভাষণ প্রদান করেন।]

জ্যঁ কার্ক প্র্যাট্রিকের ভাষণ

সাধারণ পরিষদে আফগানিস্তানের সমস্যা আরো একবার উপস্থাপিত হয়েছে। আরো একবার যথানিয়মে এবং প্রতিনিধির পর অন্য প্রতিনিধি তাঁদের বক্তৃতায় আফগানিস্তানে রুশ আগ্রসন এবং নীতিহীন গণহত্যার নিন্দা করেন। আরো একবার আমরা বিবেচনা করবো এবং গভীর প্রত্যাশায় বিপুল ভোটাধিক্যে অবিলম্বে সেখান থেকে রুশ বাহিনীর প্রস্থান, আফগানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জোটনিরপেক্ষতা রক্ষা এবং আফগান উদ্বাস্তুদের সসম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করব। কিন্তু এসব করতে গিয়ে আমরা যেনো এ-সমস্যার অনন্য গুরুত্ব নির্ণন থেকে সরে না দাঁড়াই। আজ এই পরিষদে আফগান সমস্যার চেয়ে আর কোনো অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নেই, সুদূরপ্রসারী অন্য কোনো তাৎপর্যও নেই।

সে-দেশে রুশ আগ্রসনের ফলে বা অন্য কোথাও তার জবরদস্তি ও দখলদারিত্বমূলক উপস্থিতির জন্যে আজ পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক বিলুপ্তির পথে। বস্তুত এই আগ্রাসন সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভৌগলিক অখণ্ডতা, জাতীয় স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এ-ধরনের কর্মকাণ্ড দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে নিজ পরিচয়ে অক্ষুণ্ন রেখে শান্তি এবং নিরাপত্তার মধ্যে বিকশিত হতে দেয় না।

আফগানেরা আজ জিহাদে লিপ্ত। তাঁদের এই সংগ্রামের একটি বিশেষ দিক রয়েছে। সামরিক সামর্থ্যে দুর্বল ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো যদি এভাবে আক্রান্ত হয়, পাশবিকতার শিকারে পরিণত হয় এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় তাহলে এমন রাষ্ট্রগুলোর ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? আজ যদি আফগানিস্তানের অকুতোভয়, অসীম সাহসী, মুক্তিপ্রাণ মানুষকে নিজেদের ভিটেভূমি থেকে উৎখাত করা হয়, সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়, তাদেরকে সহজে পদানত করে রাখতে প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়

তাহলে যারা হীনবল তাদেরকেও নিশ্চিতভাবে এই ভাগ্য বরণ করতে হবে। যে-প্রচেষ্টার মাধ্যমে আফগানদের পদানত করে তাদের ওপর সম্পূর্ণ ভীনদেশি সর্বগ্রাসী শাসন তন্ত্র চালিয়ে দেয়া হয়েছে, তার অমানবিক হিংস্রতা বর্তমান কম্পুচিয়ার হিংস্রতাকেও হার মানায়। বিশ্ব জানে না, আফগানিস্তানে এক চরম বর্বর শাসনতান্ত্রিক চণ্ডনীতির আড়ালে এবং আসল সত্য চেপে রেখে কী ভীষণ অন্যায় আর নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু তারপরও পাশবিকতার খবর ছড়িয়ে পড়ছে। উদ্বাস্তুদের বর্ণনা, সাংবাদিকদের কলাম-বিবরণ এবং যেসব চিকিৎসক সেখানে গিয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে খবর বেরিয়ে আসছেই। এই ঘটনার প্রচণ্ডতা অনুমান করা যায় নিজেদের ভূমি থেকে উৎখাত-হওয়া এবং প্রতিবেশী দেশে আশ্রয়গ্রহণ-করা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা থেকে। যখন রুশ আগ্রাসনের ফলে আফগানিস্তানের বাবরাক কারমালের বেআইনি সরকার [২৭-১২-১৯৭৯ থেকে ২৪-১১-১৯৮৬] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের আফগান উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে চার লাখে পৌঁছে। এসব ভিটেভূমি ত্যাগকারী মানুষ তারাকি [নুর মুহাম্মদ তারাকি, ৩০-০৪-১৯৭৮ থেকে ১৪-০৯-১৯৭৯] এবং আমিনের [হাফিজুল্লাহ আমিন, ১৪-০৯-১৯৭৯ থেকে ২৭-১২-১৯৭৯] কমিউনিস্ট শাসনামলেই বিরামহীন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিজেদের দেশ ছেড়ে পালায়। পূর্বসূরিদের অত্যাচারের চূড়ান্ত রূপ দেয়ার জন্যে বাবরাক কারমাল[৫৫] প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্যূন তিন বছর শাসনকালেই উদ্বাস্তুর সংখ্যা দশ গুণ বেড়ে গিয়ে ত্রিশ লাখে পৌঁছায়—যা আফগানিস্তানের ১৯৭৮ সালের আদমশুমারি অনুসারে আনুপাতিক জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। কোনো একটি জাতির এতো বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দেশান্তর বিশ্বে এই প্রথম। কিন্তু আফগানিস্তানে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটছে তার যথার্থ রূপ উদ্বাস্তুর এই বিপুল সংখ্যা থেকেও উদ্ধার করা কঠিন। কারণ আফগানিস্তানের ভেতরেও উদ্বাস্তু-সমস্যা রয়েছে। যুদ্ধ যেখানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে মানুষ সেখান থেকে অন্যত্র সরে পড়ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলম্বনই হচ্ছে পোড়ামাটির নীতি। ফলে এই শীত মৌসুমেও তারা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের শিকার হবে।

গত সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে বলা হয়েছিলো। তারা সে-আহ্বানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আফগানিস্তানের সৈন্যসংখ্যা এক লাখ পাঁচ হাজারে উন্নীত

---

[৫৫] বাবরাক কারমাল ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ থেকে ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত আফগানিস্ত ানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯২৯ সালের ৬ই জানুয়ারি তিনি আফগানিস্তানের কামারাইতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ১লা বা ৩রা ডিসেম্বর মস্কোতে মৃত্যুবরণ করেন।

করেছে এবং সাম্প্রতিক কালের ভয়াবহ নিষ্ঠুর সমরাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। রুশ বাহিনী তাদের অভিযানকে সুদৃঢ় করে কাবুল থেকে ২৫০ মাইল দূরে কান্দাহারের প্রতিরোধ ঘাঁটিটি কামান দাগিয়ে প্রবল গোলাবর্ষণের মাধ্যমে দখল করে নেয়। এই নৃশংস বিভীষিকাময় হামলায় অসংখ্য বেসামরিক লোক প্রাণ হারায়। দুমাস পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে হেরাত ও মাজার-ই-শরিফে। পরবর্তী বসন্ত ঋতুতে তাশকর গালে অনুরূপ নিষ্ঠুর অপারেশন চালানো হয়। পরবর্তী গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে বিমান ও ট্যাঙ্ক হামলা চালিয়ে গুজার শহরটিকে মনুষ্যবাসের অযোগ্য করে বিরান ধ্বংসক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। পৈশাচিক এই আক্রমণ যতোই তীব্রতর হয়, রুশ বাহিনীর হামলার সীমানা ততোই কাবুলের নিকটবর্তী হয়। পানশির ও লোগার উপত্যকায় সোমালি এলাকায় এবং কাবুলের কাছাকাছি জেলাগুলো ছাড়াও শৈল শহর পাগমানেও যখনতখন ও যত্রতত্র বোমাবর্ষণ চলতে থাকে। যার ফলে হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশু নিহত হচ্ছে। প্রাণে বেঁচে-যাওয়া কিছু লোক জানিয়েছেন, প্রতিরোধকারীদের খুঁজে না পেয়ে রুশ বাহিনী বেসামরিক লোকদের হত্যা করছে। কান্দাহারে রুশ বাহিনী যেভাবে হত্যা-ধর্ষণ-লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে তা বাবরাক কারমাল গোষ্ঠীর অনেক দালালকেও মর্মাহত করেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী সোমালির এক গ্রামে দশ বছরের উর্ধ্বে সকল পুরুষ সদস্যকে তাদের নারীদের সামনেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সুইডিশ সাংবাদিক বর্জ আলমক্যুইস্ট—যিনি জুলাই-অগস্ট মাসে লোগার প্রদেশ ঘুরে এসেছেন—জানান, নারী, শিশু এবং বৃদ্ধদের টেনে-হিঁচেড়ে রাস্তায় জড়ো করার পর গুলি করে হত্য করা হয়েছে। যুবকদের পিঠমোড়া করে বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় হাতাহাতি যুদ্ধে বালুর বস্তার মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, রুশ বাহিনী শস্যক্ষেত জালিয়ে দিচ্ছে। খাদ্য ও খাবার পানিতে বিষ মেশাচ্ছে এবং ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট করছে। তারা এক ধরনের প্রজাপতি-বোমা ব্যবহার করে অসংখ্য আফগানকে হত্যা করে চলছে।

১৯৮১ সালে স্বাক্ষরিত নিরাপত্তাবিষয়ক আন্তর্জাতিক চার্টার—যাতে রুশ নেতারাও স্বাক্ষর করেছেন—লঙ্ঘন করে ব্যাপক গণহত্যার উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরনের বিস্ফোরকপূর্ণ সিগারেটের প্যাকেট এবং খেলনা ব্যবহার করা হচ্ছে। আফগানিস্তানে নিয়োজিত ফরাসি ডাক্তাররা জানিয়েছেন, রুশ বাহিনী হাজারাজাত এলাকায় গ্রামে, মাঠে ও পাহাড়ি রাস্তায় মাইন ছড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বেসামরিক লোকজন অঙ্গপ্রতঙ্গ ও প্রাণ হারাচ্ছে। ড. ক্লড ম্যালহুরে বলেছেন, 'মাইনের আঘাতে হাতপা-বিচ্ছিন্ন বহু শিশুর চিকিৎসা আমরা করেছি।' সত্য প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে রুশ বাহিনী ফরাসিদের

হাসপাতালগুলো ধ্বংস করে তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। বুবিট্র্যাপ মাইনের মতো নিষিদ্ধ অস্ত্রও রুশ বাহিনী আফগানিস্তানের যত্রতত্র ব্যবহার করে যাচ্ছে। ১৯২৫ সালের জেনেভা কনভেনশন এবং ১৯৭২ সালের বায়োলজিক্যাল কনভেনশন ভঙ্গ করে তারা আফগানিস্তানে রাসায়নিক মারণাস্ত্রও প্রয়োগ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর ১১০টি দেশের সঙ্গে রুশ নেতারাও এই নীতিমালার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। এই বছরের গোড়ার দিকে আফগানিস্তানে ৪৭ বার এ-ধরনের রাসায়নিক মারণাস্ত্র প্রয়োগের খবর আমাদের কাছে রয়েছে। তিন বছর আগে সেখানে আক্রমণ শুরু করে রুশ বাহিনী এই পর্যন্ত তিরিশ হাজার আফগানকে হত্যা করেছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ তারা নির্বিঘ্নেই চালিয়ে যাচ্ছে। এই বছর রুশ যুদ্ধবন্দি আনাতোল শাখারভ তিন প্রকার রাসায়নিক মারণাস্ত্র প্রয়োগের কথা স্বীকার করেছেন। এই সোভিয়েত সৈনিকের স্বীকারোক্তির যথার্থতা পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেখানে কর্মরত চিকিৎসকেরা দেখতে পেয়েছেন। তারা জানতে পেরেছেন এইসব মারণাস্ত্রে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের শরীর দ্রুত পচে যায় এবং স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খসে যেতে থাকে। শাখারভ আরো জানিয়েছেন, আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক মারণাস্ত্র প্রয়োগের সময় রুশ সৈনিকদের গ্যাস-মুখোশ পরার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

আগামী সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুশদের রাসায়নিক মারণাস্ত্র প্রয়োগ ও জীবাণু-অস্ত্র ব্যবহারের আরো তথ্য প্রকাশ করবে যা তারা লাওস ও কম্পুচিয়াতেও অবলীলায় প্রয়োগ করে চলেছে।

আফগান মুজাহিদ এবং আফগান জনসাধারণ রুশদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে-শৌর্যবীর্য আর বীরত্বে পরিচয় দিচ্ছেন তা প্রমাণ করে যে, শতো বাধা-নির্যাতন আর প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁদের ঐক্য অটুট রয়েছে। উদাহরণসরূপ বলা যেতে পারে যে, পানশির ও পাগমান এলাকায় রুশ বাহিনী একটি ঘাঁটি স্থাপন করায় মুজাহিদেরা পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করেন এবং রুশ বাহিনী সরে যাওয়ার পর তাঁরা ঘাঁটিটি দখল করে নেন। একই ঘটনা ঘটে সোমালি এলাকায়। কান্দাহারেও মুজাহিদগণ তাঁদের প্রতিরোধ ও প্রতি-আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, গত আগস্ট মাসে সেখানকার কারাগার ভেঙ্গে সমস্ত কয়েদি বেরিয়ে পড়ে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত আর অগ্নিদগ্ধ অসংখ্য রুশ ট্যাঙ্ক আর সামরিক যান আফগানিস্তানের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। এটা তো প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে মোটেও নিরাপদ নয় এবং আফগান জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের

সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা এই যে, পুতুল সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর কোনো ইউনিটকেও সুসংহত করে যুদ্ধে নামাতে পারে নি এবং আজ পর্যন্ত কোনোরূপ সাফল্য আয় করে দেখাতে পারে নি। সামরিক বাহিনীতে বিদ্যমান জনসঙ্কট, সৈন্য-সংগ্রহে সর্বপ্রকার কঠিন ফরমান জারি, বাধ্যতামূলক সৈন্য জোগাড়ের যাবতীয় প্রয়াস এবং একজন প্রাথমিক সেনা অফিসারকে উপমন্ত্রীর সমান বেতন দেয়ার অত্যুৎসাহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে রাস্তাঘাট থেকে, বাড়িঘর থেকে ধর-পাকড় করে বল প্রয়োগের মাধ্যমে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

গত গ্রীষ্মকালে বিরাট সংখ্যক বাধ্যতামূলকভাবে তালিকাভুক্ত সৈন্য (Conscript) পালিয়ে গিয়ে প্রমাণ করেছে যে, রুশদের এই প্রচেষ্টাও পণ্ডশ্রম হয়েছে। মুজাহিদ বাহিনীকে হয়রানি এবং তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রুশ বাহিনী এবং তাদের দালালরা সাধারণ আফগান জনগণের কাছে প্রথ্যাখ্যাতই হয়েছে। কিন্তু সবকিছু জেনেও রুশ বাহিনী আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান দৃঢ় করেছে। তাদের এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছেই বলে মনে হয়। ক্ষতিকর যুদ্ধ চালিয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে নিস্তেজ করা এবং সামরিক-সংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক দিক থেকে আফগানিস্তানকে সম্প্রসারণবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গীভূত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তারা এই মতলব হাসিলে অনেক কাজই আঞ্জাম দিয়েছে। সামরিক নিয়ন্ত্রণ, সংস্থাপন, যানবাহন পরিচালনা, যোগাযোগ-ব্যবস্থাপনা, বিমানবন্দর নিয়ন্ত্রণসহ যাবতীয় অনুকূল অবকাঠামোর সবকিছুই রুশ বাহিনী নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তারা আমু দরিয়ার ওপর একটি সেতুও নির্মাণ করেছে।

চীনের সঙ্গে সংযোগকারী ও পাকিস্তানের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ওয়াখান এলাকায় ওরা স্থাপন করেছে নিজেদের ঘাঁটি। সোভিয়েত ও তার জোটভুক্ত সকল দেশের অর্থনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে আফগানিস্তানের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে আবর্তিত করানো হচ্ছে। সোভিয়েতের হীনতম প্রয়াসের মধ্যে সম্ভবত রয়েছে আফগানদের সাংস্কৃতিকভাবে নতুন মতাদর্শে নেশাগ্রস্ত করা। এই উদ্দেশ্যে রাশিয়াতে ছয় থেকে নয় বছরের ছেলেমেয়েসহ অনেকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আফগানিস্তানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহকে মর্জিমাফিক ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ বিশেষজ্ঞদের বসিয়ে মগজ ধোলাইকরণের আরেক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নতুন পাঠ্যক্রম চালু করে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছে, যাতে নতুন প্রজন্মকে সোভিয়েতের মূল ভূমিতে পাঠিয়ে সত্যকার মার্কসবাদী বানানো যায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার বর্বরতা ও সামরিক হস্তক্ষেপের প্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালের 'সওর বিপ্লব' অপরিবর্তনীয়—তাদের এই পৌনঃপুনিক ঘোষণার বিশ্লেষণ দরকার। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, কোনো রুশ বাহিনী জাতিসঙ্ঘের সনদকে ভ্রূকুটি দেখিয়ে বিশ্বজনমত ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতিকে পদদলিত করে একটি জোটনিরপেক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটালো? একমাত্র আফগান জনসাধারণ ও তাদের বৈধ সরকারই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, ১৯৭৮ সালের ঘটনাবলি পরিবর্তনযোগ্য না-কি অপরিবর্তনীয়। আফগানেরা বস্তুত অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে। তারা মুসলিম আলেমদের নিধন, জুলুম-অত্যাচার এবং রুশীয় জীবনপদ্ধতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে অনেক আগেই রুখে দাঁড়িয়েছিলো। তারা হত্যা, বর্বরতা ও পাশবিক অত্যাচারের বিপ্লবকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের জীবনদর্শনকে মূলধন করে এগিয়ে চলেছে। সারা দেশব্যাপী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রুশ নীতিকে তারা প্রতিরোধ করে চলেছে। পুল-ই-চারখা ও কারালায় রুশ বর্বরদের রচিত গণসমাধিতে বুলন্দ আওয়াজ তুলেছে। যে-বিপ্লব ইসলামকে অবমাননা করে সে-বিপ্লবকে তারা গর্বের সঙ্গে পদাঘাত করে বারবার সরিয়ে দিয়েছে। রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গোটা দেশে জনধিক্কার ফুঁসে উঠেছে। কিন্তু গণধিকৃত মার্কসবাদী সরকার টিকিয়ে রাখার জন্যে সামরিক অভিযান চালিয়ে রুশ বাহিনী তৃতীয় বিশ্বের একটি স্বাধীন দেশে ব্রেজনেভ-নীতি প্রয়োগের ব্যবস্থা নিচ্ছে।

কিন্তু এই ঘৃণ্য আগ্রাসন নীরবে মেনে নেয়া যেতে পারে না। 'আফগানিস্তানে ভ্রাতৃসুলভ সাহায্য দিচ্ছি'—সোভিয়েতের এই দাবিকে বিশ্ববাসী প্রত্যাখ্যান করেছে। 'সাময়িক সামরিক সাহায্য'—এই জাতীয় কপট আশ্বাস আজ থেকে ষাট বছর আগে সোভিয়েত রাশিয়া প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্র খিভা এবং বোখারাকেও দিয়েছিলো। এ-প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারিতে কাবুলে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের আফগান বিদেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত চিঠির উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি লিখেছিলেন, 'খিভা ও বোখারার স্বাধীন মর্যাদা আমাদের উভয় রাষ্ট্র সোভিয়েত ও আফগান সরকারের স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বিধৃত হয়েছে। আমাদের সরকার এই দুই রাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তাকে সব সময় স্বীকৃতি দিয়েছে। কেবল বোখারা সরকারের অনুরোধেই সেখানে কিছু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং বোখারা সরকারের ইচ্ছাতেই তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হবে। আমাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য কোনোমতেই বোখারায় কোনো প্রকার স্থায়ী হস্তক্ষেপ নয়।' স্মর্তব্য যে, রুশ রাষ্ট্রদূতের উল্লিখিত চিঠি লেখার দুবছর পরই খিভা ও বোখারাকে মূল

সোভিয়েত ভূমির অঙ্গীভূত করা হয়। সে-দেশদুটির ভাষা তুর্কি ও ফরাসিকে উৎখাত করে এক ধরনের রুশ ভাষা আরোপিত হয়েছে, যা এই দেশদুটিতে আঞ্চলিক উপভাষা ছাড়া কিছুই ছিলো না। মসজিদগুলোকে যাদুঘরে পরিণত করা হয়। কুরআনের শিক্ষা বাতিল করা হয়। যারা এসবের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে নির্মমভাবে হত্য করা হয়। তারপর রুশদর্শনে দীক্ষিত আমলা দিয়ে শাসনশোষণের যাঁতাকল ঘোরানোর কাজ শুরু হয়।

ষাট বছর পর আজ আফগানিস্তানের ব্যাপারে একই যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে। আফগানিস্তানে কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? আজ পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জির খতিয়ানে মনে হয় সেখানে খিভা ও বোখারার ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। সরাসরি দখলদার মনে না হলেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে রুশেরা আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান ক্রমশ চিরস্থায়ী করে চলেছে। এটা যদি চলতে দেয়া হয় তাহলে এর শেষ কোথায়? খিভা ও বোখারার মতো একই ভাগ্য কি প্রতিবেশীদের জন্যে অপেক্ষমাণ নয়?

তাই শুধু কূটনৈতিক আলোড়ন নয়, বরং মানবিক চেতনাবোধ আজ আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। আজ জাতিসঙ্ঘ সনদ, 'জোরজবরদস্তি নয়'—এই নীতিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাতীয় স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার ধ্যানধারণা বিপন্ন। এসবের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললে অতি দ্রুত এই পৃথিবীতে নৈরাজ্য নেমে আসবে এবং সবল দুর্বলের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও শোষণ চালাতে থাকবে। না, আমরা পারি না। আমরা এরূপ হতে দিতে পারি না। সোভিয়েত নেতৃবর্গের ধারণা জন্মেছে যে, আফগানিস্তানে নৃশংস আগ্রাসনের ফলে সারা বিশ্বে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া কিছুদিন ধৈর্যের সঙ্গে তাদের সয়ে যেতে হবে। জাতিসঙ্ঘ রুশদের এই কৌশলকে অবদমিত রাখতে অক্ষম। কিন্তু এই কালক্ষেপণ কোনোমতেই আগ্রাসনের অনুকূলে যাচ্ছে না। যতোই দিন যাচ্ছে আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতি ততোই ঘৃণার কারণে পরিণত হচ্ছে।

আফগানিস্তানকে মুক্ত করার এক সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত এবং আমরা ক্রেমলিন সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাদের ছলনা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা এককভাবে কিংবা এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান সামগ্রিকভাবে এটি ভাবতে চাই না যে, রুশদেরও এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকুক। আজকের প্রস্তাব আফগান সমস্যার সম্মানজনক অবসান ঘটাক—এই আমরা চাই। সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে রুশ সৈন্য আফগানিস্তান থেকে চলে যাক—ফিরে আসুক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সুযোগ এবং অগণিত আফগান

উদ্বাস্তু তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাক। এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে জাতিসঙ্ঘ রুশদের বুঝিয়ে দিচ্ছে– তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। আশা করবো, এই প্রস্তাব সমাধান ত্বরান্বিত করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘ-মহাসচিবকে এই প্রেক্ষিতে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। আমরা তাঁর প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি রুশেরা তাঁকে সহায়তা করবেন এবং এগিয়ে আসবেন এই মনে করে যে 'সময় খুবই মূল্যবান।'

অমিততেজ আফগান মুজাহিদিনি ঘন ঘন তীব্র আঘাতের মুখেও গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে স্বাধীনতা রক্ষার মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁরা কতো শক্তিমান, স্বাধীনতা রক্ষায় কী গর্বিত এই আফগান নারী-পুরুষ আর তাঁদের বীরত্ব কী সীমাহীন। আমাদের সকলের সমর্থনে তাঁরা একদিন নিজেদের মুক্ত করবেন এবং স্বাধীন জাতিসত্তা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেন—প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ভাষায় 'নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ার জন্যে'। তাঁরা তো এই-ই চান। আমরা এবং জাতিসঙ্ঘের সদস্যগণও এই প্রত্যাশা করি। [সামান্য সংক্ষেপিত]